Issue cover not available

Vol. 17 | No. 1 | 1973

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

মেঘনাদবধ কাব্যে চিত্রকল্প: সপ্তম সর্গ

Volume	17
Issue	1
Year	1973
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	জগন্নাথ চক্রবর্তী
Published online	June 1, 1973
DOI	10.62328/sp.v17i1.2
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v17i1.2
Pages	20-82
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

মেঘনাদবধকাব্যে চিত্রকল্পঃ সপ্তম সর্গ

জগন্নাথ চক্রবর্তী

যে-বিভীষণ ভোরের অন্ধকারে লক্ষণকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন নিকুম্ভিলায়, গুপ্তহত্যার শিকার বানিয়েছিলেন ইন্দ্রজিৎকে, ষষ্ঠসর্গের শেষে তাঁকেই রামচন্দ্র তুলনা করেছেন 'গ্রহরাজ' সূর্যের সংগে। কোনো বীরই মেঘনাদ-হত্যাকে বিজয় বলবেন না। নৈতিক বিচারে এই বিজয় চরম পরাজয় ছাড়া আর কিছুই নয়। ইংরেজিতে বলা যেতে পারে pyrrhic victory। এই কাপুরুষোচিত গুপ্তহত্যার অল্পক্ষণ পরেই কবি সূর্যোদয়ের বর্ণনা দিয়ে সপ্তমসর্গ আরম্ভ করেছেন। কিন্তু যে-প্রভাত শুধু রামের শিবিরকেই আনন্দ দেবে, অথচ কাপুরুষতার গ্লানি থেকে পৃথিবীকে মুক্ত করতে পারবে না, সেই প্রভাত বর্ণনা করতে গিয়ে কবি স্বচ্ছন্দ হতে পারছেন না। যে 'দিননাথ' কে রাম বিভীষণের সংগে তুলনা করছেন সেই দিননাথই সপ্তম সর্গের উদয়াদিত্য। মেঘনাদের রক্তে রক্তাক্ত এই উদয়কে মানবতাবাদী উনিশশতকী ভারতীয় রেনেসাঁসের শ্রেষ্ঠকবি মধুসূদন কখনই উদারভাবে আহ্বান করতে পারেন না। কবির মধ্যে দ্বিতীয় এক কবিসত্তা বিরোধীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে তাঁর লেখনীকে আড়ষ্ট করে দিচ্ছে। এই অন্তরীণ বিরোধ বা স্ববিরোধ সহজে ধরা যাবে না। কিন্তু যদি আমরা মাইকেল মধুসূদনের উপযুক্ত পাঠক হই তবে দেখবো এই বিরোধ ব্যঞ্জিত হয়েছে স্বর-ধ্বনির নিপুণ বিন্যাসেঃ

উদিলা আদিত্য এবে উদয় অচলে,
পদ্ম পর্ণে সুপ্ত দেব পদ্মযোনি যেন,
উন্মীলি নয়নপদ্ম সুপ্রসন্ন ভাবে,

চাহিলা মহীর পানে। উল্লাসে হাসিলা
কুসুমকুন্তলা মহী, মুক্তামালা গলে।
উৎসবে মঙ্গলবাদ্য উথলে যেমনি
দেবালয়ে উথলিল সুস্বরলহরী
নিকুঞ্জে।

আ-ধ্বনির মধ্যে আমরা পাই বিকাশ, বিস্তার ও আনন্দের ভাবটি; উ-ধ্বনির মধ্যে বন্ধন, সঙ্কোচন ও দুঃখের। সর্গের প্রথম পংক্তিতে অসংবৃত আ-ধ্বনি এবং সংবৃত উ-ধ্বনি পরস্পর পরস্পরকে সাম্যে স্থিত বা balanced করে রেখেছে। যেন রাম-শিবিরের আনন্দ, গুপ্তহত্যার লজ্জা ও গোপন সঙ্কোচ কিছুতেই কাটিয়ে উঠতে পারছে না। প্রথম পংক্তির প্রথম ও শেষের দুটি উ-ধ্বনির মধ্যে অন্তর্বর্তী দুটি আ-ধ্বনি যেন পিষ্ট হয়ে রয়েছে। শুধু প্রথম পংক্তি নয় উপরের সমগ্র অংশেও উ-ধ্বনি এবং আ-ধ্বনির সংখ্যা একেবারে সমান সমান, পনর পনর। সংখ্যার সমতা হয়তো আকস্মিক, কিন্তু balancing আকস্মিক নয়, এটি যেন নৈতিক পীড়নে পীড়িত কবিচিত্তের ইলেকট্রোকার্ডিয়োগ্রাম বা বিদ্যুল্লেখ, যা এখানে উ এবং আ-ধ্বনির সমগ্র সঞ্চার পথ বা Locus। আমাদের দেশে এখনও কাব্যবিচার ও কাব্যসমালোচনার ক্ষেত্রে গণিতযন্ত্র বা কম্পিউটারের প্রয়োগ শুরু হয় নি; খুব কম দেশেই ব্যাপকভাবে হয়েছে। তাছাড়া কাব্যের কম্পিউটারি বিশ্লেষণ অনেকেরই খুব মনঃপূত নয়। তাই উপরের গণিতযান্ত্রিক বিশ্লেষণের সমর্থনে, পাঠককে প্রথম দুটি পংক্তির উপর আরেকটু মনোযোগী হতে আহ্বান করি। দ্বিতীয় পংক্তির 'সুপ্ত' কথাটি কি ভাবের দিক থেকে 'উদিলা' কথাটিকে বেশ খানিকটা ব্যাহত এবং নির্জোর করে দিচ্ছে না? মনে হয় না কি যে প্রথম পংক্তির জাগরণ দ্বিতীয় পংক্তিতে এসে আবার ঘুমিয়ে পড়ছে? জাগ্রত সূর্যের সংগে নিদ্রিত দেবতার তুলনা একেবারে অসম্ভব নাও হতে পারে, কিন্তু একথা বলতে আমরা বাধ্য যে সমগ্রভাবে এই চিত্রকল্পটি খুব অসুখী ও অসংবদ্ধ। দ্বিতীয় পংক্তির শেষে কামছেদ চিহ্নের ব্যবহারও কবির মনের এই দ্বিধা ও অস্বাচ্ছন্দ্যেরই অব্যর্থ দ্যোতক। উৎপ্রেক্ষা অলংকারে সাদৃশ্যহেতু যে সংশয় প্রকাশ পায় এখানকার

সংশয় কিন্তু সেই আংকারিক সংশয়ের চেয়ে অনেক বেশি। প্রথম পংক্তি উচ্চারিত হবার সংগে সংগে পাঠকের মনে ষষ্ঠ সর্গে মেঘনাদের মৃত্যুর অব্যবহিত পরের বর্ণনাটি ধ্বনিত হয়ে উঠবেই—'লংকার পংকজ-রবি গেলা অস্তাচলে।' সেখানেও পংকজ এখানেও পংকজ বা পদ্মপর্ণ। ফলে সপ্তমসর্গের উদয়াচল ষষ্ঠসর্গের অস্তাচলের স্মৃতিকে গোপন রাখতে পারছে না।

যে-সর্বনাশের সংবাদ নিয়ে লংকার সূর্যোদয় হচ্ছে তাতে প্রভাতকালীন লংকার উৎফুল্ল চিত্র রচনা করতে কবি স্বভাবতই দ্বিধান্বিত। তিনি বলেছেন, 'উল্লাসে হাসিলা কুসুমকুন্তলা মহী।' যদিও অবরুদ্ধ লংকাই এখানে বর্ণনীয় বিষয়, তবু বর্ণনা দিতে গিয়ে মধুসূধন লংকার বদলে 'মহী' কথাটি ব্যবহার করেছেন। লংকা আপন সর্বনাশা বিষয়ে অজ্ঞ বলেই লংকার বহিঃপ্রকৃতিতে উল্লাসের চিহ্নগুলি সফোক্লীয় আয়রনির বাতাবরণই রচনা করেছে। কবি এরপরই মঞ্চে নিয়ে এসেছেন প্রমীলাকে। পাঠককে ভুলিয়ে রাখতে চেয়েছেন এক কপট সুখী বাতাবরণের মধ্যে। বর্ণনায় অসংবৃত আ-ধ্বনির প্রাবল্য ঘটিয়ে **relief, relaxation** এবং আনন্দ সৃষ্টি করেছেন :

> নিশার শিশিরে যথা অবগাহে দেহ
> কুসুম, প্রমীলা সতী সুবাসিত জলে
> স্নানি পীনপয়োধরা, বিনানিলা বেনী।

মেঘনাদবধ কব্যের নয় সর্গের মধ্যে পাঁচ সর্গেই প্রমীলা আছেন। প্রথম, তৃতীয়, পঞ্চম, সপ্তম ও নবম সর্গে, অর্থাৎ একসর্গ অন্তর প্রতি সর্গে কবি তাঁকে উপস্থিত করেছেন। প্রথম সর্গে বীরবাহু-বধের সংবাদ শুনে মেঘনাদ যখন ত্বরিত যুদ্ধে চলেছেন, তখন প্রমীলা ইলিয়াদ মহাকাব্যের আন্দ্রমাকের মতো যুদ্ধগামী স্বামীকে মিনতি করতে এসেছেন। তৃতীয় সর্গে প্রমীলা পতিবিরহে অধীর হয়ে স্বামীসন্দর্শনে চলেছেন শত্রুবেষ্টনী অগ্রাহ্য করে, যেখানে তিনি তেজস্বিনী বীরাঙনা ; সমগ্র তৃতীয় সর্গই অধিকার করে আছেন প্রমীলা। পঞ্চম সর্গে পাই মেঘনাদের সংগে প্রমীলার শেষ সহবাসের বর্ণনা। এখানে সপ্তমসর্গে কবি প্রমীলাকে সর্বক্ষণ এক উৎকণ্ঠা ও ট্রাজিক আয়রনির মধ্যে দাঁড় করিয়ে রেখে দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তর এবং সর্গ থেকে সর্গান্তরে চলে গেছেন। অন্ত্যসর্গে

মেঘনাদের মৃত্যুতে তাঁর সব উদ্বেগের অবসান ঘটেছে, তখন তিনি সহমরণে পতির সহগামিনী ট্রাজিক রূপসী। সপ্তম-সর্গের প্রারম্ভে প্রমীলা যখন তাঁর সখীকে বলেন, "যজ্ঞাগারে প্রাণনাথ, যাও তার কাছে" তখন পাঠক প্রমীলার ট্রাজিক অজ্ঞতায় ব্যথিত না হয়ে পারেন না। সখী বাসন্তীও একই অজ্ঞতা থেকে যখন প্রমীলাকে বলেন, "কেমনে যাইব আমি যজ্ঞাগারে, যেথা (সাজিয়েছেন রণবেশে সদা রণজয়ী) কান্ত তব, সীমন্তিনি ?" তখন একই আয়রনি দ্বিগুণিত হয়ে পাঠককে আঘাত করে। প্রমীলা ও সখী বাসন্তী দুজনেই তখন মন্দোদরীর কাছে রওনা হলেন,

যথা রক্ষ কুলেশ্বরী
আরাধেন চন্দ্রচুড়ে রক্ষিতে নন্দনে—
বৃথা।

দেখা যাচ্ছে একই আয়রনির শিকার হয়েছেন তিন রমণী।

'রক্ষিতে' পদটির ভবিষ্যৎমুখীনতা একেবারে ব্যর্থ হয়ে গেছে পরের পংক্তিতে প্রথম উচ্চারিত 'বৃথা' শব্দটির প্রয়োগে। এই দুই অক্ষরের অব্যর্থ পদটি এখানে সম্পূর্ণ একটি পংক্তির কাজ করছে। তখনো মেঘনাদ যজ্ঞাগারে রণসজ্জা করছেন এই মূর্খবিশ্বাস, প্রমীলা, সখী বাসন্তী, এবং তাঁদের সাথে রানী মন্দোদরী, সকলেই পোষণ করছেন। কিন্তু ষষ্ঠ সর্গের সব ঘটনাই পাঠকের বিদিত, কাজেই এখানে 'বৃথা' এই উচ্চারণ পাঠকের মনের কথা। যেন পাঠকেরও স্বতঃস্ফূর্ত স্বগতটিই মাইকেল নিজে তুলে নিয়ে পংক্তির প্রথমে বসিয়ে দিয়েছেন।

এরপর কবি আধুনিক চলচ্চিত্রের 'কাট'-এর ভংগিতে ক্ষিপ্রগতিতে তাঁর মুভি ক্যামেরার মুখটি ঘুরিয়ে দিয়েছেন স্বর্গের দিকে। মহাকাব্যের প্রথা অনুযায়ী এখানে কাহিনীর বিস্তার স্বর্গমর্ত্যঅন্তরীক্ষ পর্যন্ত ঘটেছে। মেঘের আড়ালে যুদ্ধ করতে ইন্দ্রজিৎ ছিলেন পারদর্শী। কিন্তু দৃষ্টির আড়ালে স্বর্গে, ধরাছোঁয়ার ঊর্ধে বসে, কলকাঠি নাড়াতে স্বর্গের দেবদেবীরা তার চেয়েও বেশি পারদর্শী। স্বর্গের পরিপ্রেক্ষিতে দেখলে লংকার রামরাবণের যুদ্ধ মনে হবে সবটাই একটা প্রকাণ্ড পুতুলনাচের কাহিনী, মর্ত্যের এপিক নায়কের ভূমিকায় যারা অবতীর্ণ

তাঁদের পিছনেও অদৃশ্য সূতো বাঁধা, এবং সেই সূতো ধরে যাঁরা নাড়াচ্ছেন তাঁরা স্বর্গের দেবদেবী। আবৃত্ত দৃষ্টিতে দেখলে, ষষ্ঠ সর্গে যে ইন্দ্রজিতের পতন ঘটেছে তা শুধু উমার মনোরথ পূর্ণ করবার জন্য, এবং ইন্দ্রকে খুশি করবার জন্য। এখন মহেশ্বর তাঁর ভক্ত রাবণকে তুষ্ট করতে চান এবং এইভাবে উভয়পক্ষের প্রতি সমদৃষ্টি দেখাতে চান ঃ—

তুষিনু বাসবে, সাধ্বি, তব অনুরোধে ;
দেহ অনুমতি এবে তুষি দশাননে।

দূতবেশী বীরভদ্রকেও মহেশ্বর বলেছেন, 'পশি যজ্ঞাগারে নাশিল সৌমিত্র তারে উমার প্রসাদে। গ্রীক মহাকাব্যে মর্ত্যের সমস্ত ঘটনাকে স্বর্গের সংগে বেঁধে দেওয়া হয়েছে। ঐ একই রীতিতে মাইকেল মধুসূদন লংকার রণাংগণকে যুক্ত করে দিয়েছেন কৈলাসের সংগে। কাহিনীর ব্যাপ্তি ঘটিয়ে কবি স্বর্গ থেকে দূত পাঠিয়েছেন ইন্দ্রজিৎ নিধনের সংবাদ রাবণের কাছে পৌঁছে দিতে। ভগ্নদূতের কথা কৃত্তিবাসেও আছে। কিন্তু সে দূত রাক্ষসরাই নিজেদের মধ্য থেকে নির্বাচিত করেছে। ভীত রাক্ষসগণের কেউই এই দুঃসংবাদ রাবণকে দিতে সাহসী হবে না এটি স্বাভাবিক। কিন্তু মধুসূদন এই দুঃসংবাদকেই দেবতাদের পক্ষে একটি জরুরী হাতিয়ার হিসেবে নতুনভাবে সৃষ্টি করেছেন। মহাদেব চান তাঁর ভক্ত রাবণ পুত্রবধের পাল্টা আঘাত হানুক ; তিনি চান রাবণ রুদ্রতেজে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠুক। মধুসূদনও চান রাবণের কাছে পুত্রবধের সংবাদ উদ্দীপকের কাজ করুক, এবং ক্রোধ হোক স্থায়িভাব, এবং এইভাবে মহাকাব্যের উপযোগী রৌদ্ররস সৃষ্টি হোক। মহাদেব অতএব বীরভদ্রকে সংগত কারণেই বলেছেন ঃ

কনকলংকায় শীঘ্র যাও, ভীমবাহু,
রক্ষোদূত বেশে তুমি ; ভর, রুদ্রতেজে,
নিকষানন্দনে আজি আমার, আদেশে।

রাবণের মধ্যে রুদ্রতেজ সঞ্চারিত করার তাগিদে এখানে ভগ্নদূত প্রসংগ, এবং তা মনস্তত্ত্ব সম্মত। কিন্তু কৃত্তিবাসে দেখি, রাক্ষসরা সরাসরি নিজেদের মধ্য থেকে একজনকে ভগ্নদূত নির্বাচন করে রাবণের কাছে পাঠিয়েছে এবং এটি ঘটেছে খুব সোজাসুজি ঃ

মেঘনাদ পড়ে রণে প্রভাত সময়।
ভয়ে রাবণের আগে কেহ নাহি কয়।
গগনে হইল বেলা দ্বিতীয় প্রহর।
বসিয়া মন্ত্রণা করে যত নিশাচর॥
স্থানে স্থানে বসি যুক্তি করেছে রাক্ষস।
কহিতে রাবণ আগে না করে সাহস॥
পাত্রমিত্র সকলেতে মন্ত্রণা করিয়া।
ভগ্নদূত একজন দিল পাঠাইয়া॥
রাবণ সম্মুখে কহে যোড় করি হাত।
রণের সংবাদ শুন রাক্ষসের নাথ॥
লংকাপুরী বীরশূন্য হৈল এতদিনে।
মেঘনাদ পড়ে আজি লক্ষণের বানে॥

মধুসূদনের দূত শুধু সংবাদ বাহক নয়, সে সংবাদপরিবেশকও, যাকে আমরা আধুনিক সংবাদপত্রের ভাষায় বলি রিপোর্টার। কৃত্তিবাসের ভগ্নদূতের মতো অপরের তৈরী সংবাদ নিয়ে সে খুশি নয়, সে নিজে সংবাদের উৎপত্তি স্থলে গিয়ে হাজির হয়, ঘটনাকে চাক্ষুষ করে এবং 'নিজেকে নিজস্ব সংবাদদাতা'য় রূপান্তরিত করে নেয়। মধুসূদনের দূত তাই কৈলাস থেকে সোজা লংকার রাজসভায় না গিয়ে প্রথমে যায় নিকুম্বিলা যজ্ঞাগারে, প্রত্যক্ষ করে নিহত ইন্দ্রজিৎকে, এবং সমগ্র পরিস্থিতির বাস্তবতা অনুভব করে নিজের মধ্যে। এরই ফলে মধুসূদনের বীরভদ্র এত বাস্তব এবং এমনভাবে পাঠকের মনে স্পষ্ট দাগ কাটে; আর কৃত্তিবাসের ভগ্নদূত এত অবাস্তব এবং শুধু অনামা নয়, অস্পষ্টও। এই প্রত্যক্ষতা হোমারীয় মহাকাব্যের একটি বিশিষ্ট রীতি। এবং এই প্রত্যক্ষণের ফল হিসেবেই সেখানে বাক্যরচনায়ও এসেছে পারাতাক্‌সিস রীতির ব্যবহার। একই পারাতাক্‌সিস রীতি অবলম্বনে মধুসূদন বীরভদ্রের আকাশ-পরিক্রমার একটি দ্রুত শব্দচিত্র রচনা করছেন; বর্ণনাগুলি মুভিক্যামেরার পৃথক পৃথক শটের মতো দ্রুতনিষ্পন্ন, এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ, যদিও সমগ্রভাবে আবার একটি পরম্পরা আমাদের চোখের ওপর ভেসে ওঠে:

(১) চলিলা আকাশপথে বীরভদ্র বলী
ভীমাকৃতি; (২) ব্যোমচর নমিলা চৌদিকে
সভয়ে; (৩) সৌন্দর্য তেজে হীনতেজঃ রবি,
(৩-ক) সুধাংশু নিরংশু যথা সে রশ্মির তেজে।
(৪) ভয়ংকরী শূলচ্ছায়া পড়িল ভূতলে।
(৫) গম্ভীর নিনাদে নাদি অম্বুরাশিপতি
পূজিলা ভৈরবদূতে। (৬) উত্তরিলা রথী
রক্ষঃপুরে; (৭) পদচাপে থর থর থরি
কাঁপিল কনকলংকা. (৭-ক) বৃক্ষশাখা যথা
পক্ষীন্দ্র গরুড় বৃক্ষে পড়ে উড়ি যবে।

এই সাতটি দ্রুত শটের মধ্যে কোথাও কোনো সংযোজক অব্যয়ের ব্যবহার নেই; কার্যকারণবোধক অব্যয় তো নেইই, এমনকি অতি সাধারণ 'এবং' শব্দটি পর্যন্ত কবি একবারও ব্যবহার করেননি। 'যথা' পদটি ব্যবহার করে তৃতীয় ও ৭ম শটে কবি উপমাচ্ছলে প্রকৃতপক্ষে ৩ক ও ৭ক এই দুটি অতিরিক্ত শট গ্রহণ করেছেন। ফলে ১০টি পংক্তিতে গৃহীত মোট সাতটি শট হয়ে দাঁড়িয়েছে মোট ন-টি শট। চলচ্চিত্রের ভাষায় ৩ এবং ৩ক, ৭ এবং ৭ক একই ধরনের যৌথচিত্র, যথাক্রমে নিষ্প্রভন ও কম্পনের নির্বাকচিত্র। কৃত্তিবাসে দেখি রাক্ষসরা মন্ত্রণা ও যুক্তিতেই দু-প্রহর সময় কাটিয়ে দিয়েছে। অথচ আরো অল্প সময়ের মধ্যে মাইকেল মধুসূদনের দূত শুধু স্বর্গ মর্ত্য অন্তরীক্ষই পরিক্রম করেনি, নিজের মধ্যে সঞ্চারিত করেছে এক দ্বিধাময় মনস্তাত্ত্বিক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব যা কৃত্তিবাসের কল্পনার বাইরে। মধুসূদন যে কত বড়ো শিল্পী তা এখানকার ছোট দৃষ্টান্ত দিয়েই বোঝানো যেতে পারে। উপায় ও অন্বিষ্ট, কার্য ও কারণ বা ends and means-এদের মধ্যে সমন্বয়ের কল্পনা ভারতীয় দার্শনিক চিন্তার একটি বৈশিষ্ট্য। দার্শনিক বিচারে কার্য ও কারণ মূলত এক ও অভিন্ন, যেমন জনক ও জাতক একই ধাতুতে গড়া। মহেশ বীরভদ্রকে বল্লেন, "ভর রুদ্রতেজে, নিকষানন্দনে আজি আমার আদেশে।" বীরভদ্র কি করে রুদ্রতেজ রাবণের মধ্যে সঞ্চারিত করবেন যদি তাঁর নিজের মধ্যে সেই তেজ সঞ্চারিত না হয়? অতএব মধুসূদন দেখালেন যে আদেশপ্রাপ্ত বীরভদ্র নিজেই হয়ে

উঠেছেন রুদ্রতেজে ভরপূর এক সত্তা—আধুনিক বিজ্ঞানের পরিভাষায় যেন একটি পারমাণবিক ক্ষেপনাস্ত্র ; এই ক্ষেপানস্ত্র যখন রাবণের বুকে গিয়ে আঘাত করবে রাবণের মধ্যেও ঘটবে তেজস্ক্রিয় বিস্ফোরণ যার প্রতিক্রিয়ায় রাবণ আবার ঘটাবেন আরো দাবদাহী প্রচণ্ড বিধ্বংসী বিস্ফোরণ। এই সর্গে অচিরেই আমরা রাবণের ক্রোধ প্রত্যক্ষ করবো, কিন্তু সেই ক্রোধও যেন সম্পূর্ণ রাবণের ক্রোধ নয়, স্বর্গ থেকে প্রেরিত রাবণের মধ্যে অবতীর্ণ এক দৈব ক্রোধ বা দৈবতেজ, তারই পটভূমি রচনা করেছেন মহাকবি। তাই বীরভদ্র শুধু সংবাদবাহক নন, তিনি বলী, ভীমাকৃতি, আকাশচারীরা ভয়ে তাঁকে নমস্কার করছে, সূর্যের তেজ পর্যন্ত তাঁর তেজের কাছে ম্লান এবং তাঁর ছায়ার মধ্যে শিবের শূলের ছায়াই প্রতিফলিত, এবং সে-ছায়া ভয়ংকরী। সমুদ্রাধিপতি বরুণ পর্যন্ত ঢেউয়ের গর্জন ধ্বনিত করে তাঁকে প্রণিপাত জানালেন। কৃত্তিবাসের অতিসাধারণ অনামা "ভগ্নদূত একজন দিল পাঠাইয়া"-র সংগে তুলনায় বীরভদ্রের বর্ণনা যে অনেক বেশি বলী তাই নয়, অনেকগুণ বেশি জীবন্তও। বীরভদ্র যদি কেবলমাত্র দূত হতেন তাহলে তাঁর নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে যাবার কোনো প্রয়োজনই ঘটতো না। কারণ তিনি সাক্ষাৎ শিবের মুখ থেকে মেঘনাদ বধের সংবাদ বহন করে এনেছেন। তাঁর কাজ শুধু সংবাদ দেওয়া নয়; রাবণকে 'রুদ্রতেজে' পূর্ণ করাই তাঁর আসল কাজ। আর সেজন্যই তিনি সর্বপ্রথম তাঁর নিজের মধ্যে রাবণের সম্ভাব্য ব্যক্তিত্বটি প্রতিষ্ঠা করে নিচ্ছেন। তাই রক্তাপ্লুত ইন্দ্রজিতের সামনে দাঁড়িয়ে—

সজল নয়নে বলী হেরিলা কুমারে।
ব্যথিল অমর-হিয়া মর দুঃখ হেরি।

দেবতারা হৃদয়হীন ; মর্ত্যমানুষের ব্যথায় সমব্যথী হওয়া তাদের স্বভাববিরুদ্ধ। কিন্তু এখানে দেবদূতের হৃদয় মানুষের হৃদয়ের ধর্ম গ্রহণ করেছে দেখা যাচ্ছে। এখানে বীরভদ্র যেন রাবণের চোখ দিয়ে নিহত ইন্দ্রজিৎকে দেখছেন। রাবণের ব্যথাই তাঁর মনের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে। এক হিসেবে এখানে সমগ্র মহাকাব্যের সর্বক্ষণের প্রত্যক্ষদর্শক মহাকবি মাইকেল মধুসূদনই স্বয়ং মেঘনাদবধে ব্যথিত হয়ে পড়েছেন, এবং শিল্পীর মনোব্যথাই বীরভদ্রের চোখকে সজল করেছে। মধুসূদন তাঁর বন্ধুকে এক পত্রে লিখেছিলেন :

"It was a struggle whether Meghnad will finish me or I finish him. Thank Heaven, I have triumphed. He is dead, that is to say, I have finished the VI Book in about 750 lines. IT COST ME MANY A TEAR TO KILL HIM"

কবির এই অশ্রু এখানে বীরভদ্রের দৃষ্টিকে সজল করেছে।

বীরভদ্র এরপর রাবণের রাজসভায় উপস্থিত হলেন ঃ

কনক—আসনে যথা দশানন রথী,
রক্ষঃকুল চূড়ামনি, উতরিলা তথা।
দূতবেশে বীরভদ্র, ভস্মরাশি মাঝে
গুপ্ত বিভাবসু সম তেজোহীন এবে।

মেঘনাদবধ কাব্যের প্রারম্ভের দৃশ্যটি এখানে মনে না এসেই পারে না। প্রথম সর্গে বীরবাহুবধের সংবাদ নিয়ে যখন ভগ্নদূত রাবণ সকাশে এসেছিল তখনও

কনক—আসনে বসে দশানন বলী
হেমকুট-হৈমশিরে শৃংগবর যথা
তেজঃপুঞ্জ।

কিন্তু বীরচূড়ামনি বীরবাহুর মৃত্যু ঘটেছিল 'সম্মুখ সমরে'; সে ছিল বীরের মৃত্যু। আর এখানে ভগ্নদূত যে-মৃত্যুর সংবাদ নিয়ে এসেছে তা কাপুরুষ গুপ্তহত্যার শিকার হয়ে মৃত্যু। বীরভদ্র শুধু নিহত মেঘনাদকে দেখেই আসেননি, তার সংগে একাত্মতাও বোধ করে এসেছেন। সংবাদের সংগে সাংবাদিকের এমন একাত্মতা বা আত্মীয়তা সহজে চোখে পড়ে না। পূর্বের সর্গে নিহত মেঘনাদ তুলিত হয়েছেন 'নির্বাণ' পাবকের সংগে, এখানে দূতবেশী বীরভদ্র তুলিত হয়েছেন 'ভস্মরাশি মাঝে গুপ্ত বিভাবসুর' সংগে। শুধু মেঘনাদের সংগেই নয় পরোক্ষে যেন anticipation বা অনুমিতি হিসেবে রাবণের সংগেও মহাকবি তাকে তুলিত করেছেন। রাবণ অচিরেই শোকার্ত হবেন এবং ইন্দ্রজিৎকে হারিয়ে নিস্তেজ হয়ে পড়বেন। কবি বাক্যের অন্বয়ে দ্ব্যর্থবোধকতার আশ্রয় নিয়ে এই ইংগিত দিয়েছেন বলে মনে হয়। কারণ, 'ভস্মরাশি মাঝে গুপ্ত বিভাবসু সম তেজোহীন এবে' এটি রাবণ ও বীরভদ্র উভয়ের সংগেই অন্বিত হতে পারে এবং এই মুহূর্তে না হলেও অচিরেই এই বর্ণনা পুত্র-শোকাহত রাবণের পক্ষেই বেশি প্রযোজ্য হবে;

অতএব প্রথম সর্গের তেজঃপুঞ্জের বিপরীত পদ হিসেবেই সপ্তমসর্গে 'তেজোহীন' পদটি ব্যবহৃত হয়েছে, একথা মনে করতে খুব একটা কষ্ট কল্পনার প্রয়োজন হয় না। একদিকে পূর্বানুমিতি বা অ্যানটিসিপেশন অন্যদিকে রাবণের ক্ষেত্রে অজ্ঞতাজনিত আয়রনির প্রয়োগ, এক অমোঘ ট্রাজিক পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। তখনও রাবণের ধারণা ইন্দ্রজিৎ জীবিত এবং যুবরাজ ইন্দ্রজিৎ যুদ্ধ সাজে সজ্জিত হচ্ছেন,—

'দেব দৈত্যজয়ী / লংকার পংকজরবি সাজিছে সমরে / আজি।'

মধুসূধন এই দূত-পরিকল্পনায় সম্ভবত হোমরের ইলিয়াদ মহাকাব্যের সর্বশেষ (২৪শ) সর্গটি স্মরণ করে থাকবেন। হেক্তর বধের পর পুত্রশোকে কাতর প্রায়াম (Priam) যখন শুনলেন যে গ্রীক সেনাপতি আকিলেস (Achilles) হেকতরের মৃতদেহ তাঁর রথের চাকায় বেঁধে প্রতিদিন রাস্তায় রাস্তায় চক্কর দিচ্ছেন, তখন পুত্রের শবদেহ কি করে গ্রীকদের কাছ থেকে ফিরিয়ে এনে সৎকার করা যায়, সেকথা ভেবে তিনি উদ্বিগ্ন হলেন। তখন দেবরাজ জিয়ুস আইরিস (Iris)-কে ডেকে বল্লেন, 'যাও রাজা প্রায়ামকে বলো, তিনি যেন হেকতরের শবদেহের মুক্তিপণ স্বরূপ মূল্যবান উপঢৌকন নিয়ে একা যান গ্রীকদের জাহাজের কাছে।' আইরিসও এই আদেশ পাওয়া মাত্র বায়ুগতিতে বার্তা বহন করে গেলেন প্রায়ামের প্রাসাদে—

> The messenger of Zeus stood by Priam and spoke softly to him, but fear fell upon him as she did so. "Take heart", she said, 'Priam, offspring of Dardanus, take heart and fear not. I bring no evil tidings, but am minded well towards you. I come as a messenger from Zeus, who though he be not near, takes thought for you and pities you. The lord of Olympus bids you go and ransom noble Hector, and take with you such gifts as shall give satisfaction to Achilles. You are to go alone, with no other Trojan, save only some honoured servant who may drive your mules and waggon, and bring back to the city the body of him whom noble Achilles has slain.....
>
> (Iliad : XXIV, Samuel Butler-কৃত অনুবাদ)

কিন্তু হোমরের আইরিস (**Iris**) দূতী মাত্র, জিয়ুস-নির্দেশের বাইরে তার কোনো ব্যক্তিত্ব বা ভূমিকা নেই, তাকে স্বতন্ত্র ব্যক্তি বলে চেনাই দুষ্কর। মাইকেল মধুসূদনের বীরভদ্র কিন্তু কেবলমাত্র মুখস্থ বাক্য উদগীরণ করেন না, তিনি তাঁর বুদ্ধি, বিবেচনা ব্যক্তিত্ব প্রয়োগ করেন এবং তাঁকে একটি স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ববান মানুষ বলে আমরা মনে রাখতে পারি। এইখানেই মাইকেলের আধুনিকতা। দূত কর্তৃক বীরবাহুর মৃত্যু সংবাদ পরিবেশনের দৃশ্যটি ঘটেছিল মহাকাব্য শুরু হবার অব্যবহিত পূর্বে, তাই সেই দুঃসংবাদের প্রাথমিক 'শক্' রাবণকে কিভাবে আঘাত করেছিল তার কোনো বর্ণনা আমরা প্রথম সর্গে পাই না। প্রথম সর্গে যখন আমরা রাবণকে প্রথম দেখি, তখন তিনি পুত্র বীরবাহুর শোকে অবিরল ধারায় অশ্রুবিসর্জন করছেন, কিন্তু তাঁর শোক প্রকাশের ভংগিটি একেবারে নীরব—যথা তরু, তীক্ষ্ণশর সরস শরীরে/বাজিলে কাঁদে নীরবে।'

সপ্তম সর্গে পুত্র মেঘনাদের নিধন সংবাদে কিন্তু রাবণ ভীম গর্জন করে উঠে তারপর পড়ে যান ঃ

> যথা যবে ঘোর বনে নিষাদ বিঁধিলে
> মৃগেন্দ্রে নশ্বর শরে, গর্জি ভীমনাদে,
> পড়ে মহীতলে হরি, পড়িলা ভূপতি
> সভায়।

উভয় বাক্‌চিত্রই বনের, এবং উভয় ক্ষেত্রেই তীক্ষ্ণ বা 'নশ্বর' শর ব্যবহৃত। কিন্তু প্রথম ক্ষেত্রে শরব্য হচ্ছে নির্বাক সহিষ্ণু তরু, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ভীমনাদী ক্ষিপ্ত সিংহ।

মূর্ছাহত রাবণকে এখন অনায়াসেই বলা যেতে পারে 'ভস্মরাশি মাঝে গুপ্ত বিভাবসু সম তেজোহীন এবে।' এই নিস্তেজ শোকাহত রাবণকে 'রুদ্রতেজে' পূর্ণ করে তুলবেন বলেই বীরভদ্রের আসা, এবং তিনি করলেনও তাই ঃ

> রুদ্রতেজে বীরভদ্র আশু চেতনিলা
> রক্ষোবরে। অগ্নিকণা পরশে যেমনি
> বারুদ.....

আমরা আগেই তেজস্ক্রিয় বিস্ফোরণের কথা বলেছি, যার ঘটক হচ্ছেন বীরভদ্র। এখানে বারুদের চিত্রকল্পটি আমাদের পূর্ব সিদ্ধান্তকেই সমর্থন করছে।

পারাতাক্‌সিস রীতির মূলকথা প্রত্যক্ষতা। মাইকেল হোমর ও ভর্জিলের কাছে এই পারাতাক্‌সিস রীতির জন্য ঋণী। তাঁর দূত স্বচক্ষে যা দেখেন, অপরের কাছে বর্ণনা করার সময়ও ঠিক সেই প্রত্যক্ষদর্শীর ভাবটি বজায় রেখেই তা করেন। দূত বীরভদ্র নিজে নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে গিয়ে যে-দৃশ্য দেখেছিলেন হুবহু সেই দৃশ্যই রাবণের কাছে নিবেদন করছেন, যেন নিজের প্রত্যক্ষ অনুভবকেই পুনরুক্ত করছেন রাবণের কাছে ঃ

পশি যজ্ঞাগারে শূর দেখিলা ভূতলে
বীরেন্দ্রে। প্রফুল্ল, হায়, কিংশুক যেমতি
ভূপতিত বনমাঝে প্রভঞ্জন বলে।

এবং

ছদ্মবেশে পশি
নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে সৌমিত্রি কেশরী,
রাজেন্দ্র, অন্যায়যুদ্ধে বাধিল কুমতি,
বীরেন্দ্রে। প্রফুল্ল, হায়, কিংশুক যেমনি
ভূপতিত বনমাঝে প্রভঞ্জন-বলে,
মন্দিরে দেখেনু শূরে।

এই ধরনের হুবহু কথন বা পুনরুক্তি হোমরেও আছে ; মধুসূদন হোমরের কাছ থেকেই এ বিষয়ে পাঠগ্রহণ করেছেন।

বীরভদ্র রুদ্রতেজে রাবণকে উদ্দীপ্ত করতে এসেছেন। রাবণ যদি শোকে ভেঙে পড়েন তবে তিনি পুত্রহত্যার প্রতিশোধ নিতে পারবেন না। শুধু মহাদেবের নয়, মহাকাব্যের স্বার্থেও মাইকেল মধুসূদনের আগ্রহ এখানে স্ফুটিত। কারণ মহাকাব্যকে শোকগাথা থেকে বীরগাথার জগতে তুলতে না পারলে তা মহাকাব্য হিসেবে ব্যর্থ হবে। এবং সেইজন্যই বীরভদ্রের মুখে রাবণের উদ্দেশ্যে এইকথা তিনি বলিয়েছেন ঃ

বীরশ্রেষ্ঠ তুমি,
রক্ষোনাথ, বীরকর্মে ভুল শোক আজি।

পরক্ষণেই আমরা দেখছি শোক বা করুণ রসের প্রসঙ্গ অতিক্রম করে এই

সর্গে দ্রুত বীররসের অবতারণা করা হচ্ছে। যুদ্ধ যেহেতু ধ্বংসের, অতএব কবি এখানে প্রলয়কালের চিত্রকল্প ব্যবহার করেছেন ঃ

উথলিল সভাতলে দুন্দুভির ধ্বনি,
শৃঙ্গ নিসাদক যেন, প্রলয়ের কালে,
বাজাইলা শৃঙ্গবরে গম্ভীর নিনাদে।
যথা সে ভৈরব রবে কৈলাস শিখরে
সাজে আশু ভূতকুল, সাজিল চৌদিকে
রাক্ষস; টলিল লঙ্কা বীরপদভরে।

রুদ্রের প্রলয় বিষাণ ও বাইবেলোক্ত শেষ বিচারের পূর্বেকার তূরীধ্বনি (**the trumpet shall sound**) উভয়কেই মাইকেল সাহসের সঙ্গে যুগপৎ এখানে গ্রহণ করেছেন। রাক্ষস সজ্জার চিত্রকল্প হিসেবে ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল কাব্যের বর্ণনাটিও তিনি এখানে বেশ সঙ্গতভাবে নিয়েছেন, সেখানেও শিঙ্গা-ধ্বনির উল্লেখ রয়েছে ঃ

মহারুদ্ররূপে মহাদেব সাজে।
ভবন্তম্ ভবন্তম্ শিঙ্গা ঘোর বাজে॥

যুদ্ধোদ্যমের বর্ণনায় কবি চণ্ডী থেকে মহিষাসুরের পক্ষভুক্ত সেনানায়কদের বিবরণ সংগ্রহ করেছেন। এবং একটু পরে সমগ্র রাক্ষস বাহিনীকেই কবি চণ্ডীর সঙ্গে তুলনা করেছেন। স্বয়ং চণ্ডীই হয়ে উঠেছেন রক্ষোবাহিনীর চিত্রকল্প ঃ

যথা দেবতেজে জন্ম দানবনাশিনী
চণ্ডী, দেব অস্ত্রে সতী সাজিলা উল্লাসে
অট্টহাসি, লঙ্কাধামে সাজিলা ভৈরবী
রক্ষঃকুল-অনীকিনী—উগ্রচণ্ডা রণে
গজরাজতেজঃ ভুজে ; অশ্বগতি পদে ;
স্বর্ণরথ শিরঃচূড়া ; অঞ্চল পতাকা
রত্নময় ; ভেরী, তুরী, দুন্দুভি, দামামা
আদি বাদ্য সিংহনাদ। শেল, শক্তি, জাটি,
তোমর, ভোমর, শূল মুষল মুগদ্‌র ;
পট্টিশ, নারাচ, কৌন্ত-শোভে দন্তরূপে।

জনমিল নয়নাগ্নি সাঁজোয়ার তেজে।
থর থর থরে মহী কাঁপিলা সঘনে;
কল্লোলিলা উথলিয়া সভয়ে জলধি;
অধীর ভূধররজ,—ভীমার গর্জ্জনে,—
পুনঃ যেন জন্মি চণ্ডী নিনাদিল রোষে।

এই দীর্ঘ সাঙ্গরূপকোপম উপমাটিকে এক নতুন ধরনের এপিক উপমা বলা যায়। হোমর বা মিলটনের দীর্ঘ এপিক উপমা থেকে এটি একেবারে স্বতন্ত্র। হোমর বা মিলটনের দীর্ঘ উপমা স্বতন্ত্র একটি চিত্র, কাহিনী, বা কথার বদ্বীপ হয়ে উঠে, শুধু দীর্ঘায়িত অলঙ্কারেই পর্যবসিত থাকে না। কিন্তু এখানে স্পষ্টই বোঝা যায়, মাইকেল কোনো নতুন কাহিনীকে অবতরণ করতে চাইছেন না, বা কোনো নতুন ল্যাণ্ডস্কেপও রচনা করেছেন না বা যুদ্ধোদ্যমের বর্ণনা থেকে একটুও তিনি সরছেন না। কাব্যের একটি অলঙ্কার বা ফীগর অব স্পীচকেই স্ফীত করে তিনি রাক্ষসবাহিনীর প্রতিমাকে ডাকের সাজে সাজাচ্ছেন। মহাকাব্যের চেয়ে কাব্যেই এই ধরনের দীর্ঘায়িত ফীগর অব স্পীচ সাধারণত বেশি দেখা যায়। যেমন মেঘদূতে 'উত্তরমেঘ' খণ্ডের প্রথম শ্লোকটিতেই রয়েছে :

বিদ্যুৎবন্তং ললিতবনিতাঃ সেন্দ্রচাপং সচিত্রাঃ
সংগীতায় প্রহতমুরজাঃ স্নিগ্ধ গম্ভীর ঘোষম্।
অন্তস্তোয়ং মণিময় ভুবস্তুংগমভ্রংলিহাগ্রাঃ
প্রাসাদাস্তাং তুলয়িতুমলং যত্র তৈস্তৈর্বিশেষৈঃ॥

মল্লিনাথ একে পূর্ণোপমা এবং বিম্ব প্রতিবিম্বভাবের উদাহরণ হিসেবে বর্ণনা করেছেন, কারণ মেঘে যেমন বিদ্যুৎ, অলকার প্রাসাদে তেমন সুন্দরী নারী; মেঘের যেমন ইন্দ্রধনু প্রাসাদের তেমনি চিত্রাবলী; মেঘের যেমন লঘুগুরু গর্জন, প্রাসাদের অভ্যন্তরে তেমনি মুরজ বাদ্যের আওয়াজ; মেঘের মধ্যে যেমন জল, প্রাসাদের মধ্যে তেমনি মনিখচিত ভূমি; মেঘ যেমন সু-উচ্চ, প্রাসাদ চূড়াও তেমনি আকাশস্পর্শী। বলা বাহুল্য, কালিদাসের লিরিকে দীর্ঘায়িত উপমা ব্যবহার করে কোন উপ-আখ্যান রচনার অবকাশই নেই, তিনি পূর্ণোপমাকে শুধু

জড়োয়া অলংকার হিসেবেই ব্যবহার করেছেন। মাইকেল মধুসূদনও ঠিক তাই। চণ্ডীর বাহুতে ছিল মত্তগজের বল, রাক্ষসবাহিনীতে রয়েছে গজসৈন্য; চণ্ডীর চরণে ছিল অশ্বগতি, রাক্ষস বাহিনীতে রয়েছে অশ্বদল; চণ্ডীর শিরে ছিল স্বর্ণকিরীট, রাক্ষসবাহিনীতে আছে স্বর্ণরথ; চণ্ডীর বসনাঞ্চল ছিল রত্নখচিত, রাক্ষসবাহিনীর পতাকাও রত্নখচিত; সিংহবাহিনী চণ্ডীর সিংহের ছিল ভীমগর্জন, রাক্ষসবাহিনীতেও আছে ভেরী, তুরী, দুন্দুভি, দামামা প্রভৃতি বাদ্যের গম্ভীর রণনাদ; চণ্ডীর ছিল শানিত দন্তপংক্তি, রাক্ষসবাহিনীর রয়েছে শেল, শক্তি, জাটি, তোমর, ভোমর, শূল, মুষল, মুদ্‌গর, পট্টিশ, নারাচ, কৌন্ত প্রভৃতি শানিত অস্ত্র; চণ্ডীর নয়নে ছিল নেত্রাগ্নি, রাক্ষসবাহিনীতেও রয়েছে বর্ম থেকে বিচ্ছুরিত অগ্নিময় দীপ্তি। কিন্তু মাইকেলের এই সুদীর্ঘ পূর্ণোপমা শুধুমাত্র অলংকরণের কাজেই সমাপ্ত হয়ে যায়নি। এই উপমার মধ্যে কবি যে তাঁর সমগ্র নৈতিক দৃষ্টিভংগিটিও চিহ্নিত করে দিয়েছেন, তা সমালোচকদের মনোযোগ এড়িয়ে গিয়েছে। মনে রাখা দরকার যে, দেবী চণ্ডী রণসাজে সজ্জিতা হয়েছিলেন দৈত্যবিনাশের জন্যই। যে-দৈত্যদের বিরুদ্ধে তিনি লড়েছিলেন তারাই চামর, উদগ্র, বাস্কল, অসিলোমা, বিড়ালাক্ষ, মাইকেলের মহাকাব্যে রাবণের অনীকিনীর অন্তর্গত। অথচ মাইকেল এইসব দৈত্যের নাম উল্লেখ করার অব্যবহিত পরেই আবার সমগ্র রাক্ষসবাহিনীকেই চণ্ডীর সংগে তুলনা করছেন—'পুনঃ যেন জন্মি চণ্ডী নিনাদিল রোষে।' রাক্ষসসৈন্য বাহিনীর শক্তি বুঝাবার জন্য মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত চণ্ডী থেকে কবি যে চিত্রকল্পটি সংগ্রহ করেছেন তা হচ্ছে ঃ

যথা দেবতেজে জন্মি দানবনাশিনী
চণ্ডী, দেবঅস্ত্রে সতী সাজিলা উল্লাসে
অট্টহাসি, লংকাধামে সাজিলা ভৈরবী
রক্ষঃকুল—অনীকিনী—

দেবতেজ থেকে চণ্ডীর সৃষ্টির বর্ণনা এরূপ ঃ

ইত্থং নিশম্য দেবানাং বচাংসি মমুসূদন ঃ।
চকার কোপং শম্ভুশ্চ ভ্রূকুটীকুটিলাননো ॥
ততোইতি কোপপূর্ণস্য চক্রিণো বদনাৎ তত ঃ।

নিশ্চক্রাম মহৎ তেজো ব্রহ্মণঃ শঙ্করস্য চ ॥
অন্যেষাঞ্চৈব দেবানাং শক্রাদীনাং শরীরতঃ ।
নির্গতং সুমহৎ তেজস্তচ্চৈক্যং সমগাচ্ছত ॥
অতীব তেজসঃ কূটং জ্বলন্তমিব পর্বতম্ ।
দদৃশুস্তে সুরাস্তত্র জ্বালা ব্যাপ্ত দিগন্তরম্ ॥
অতুলং তত্র তত্তেজঃ সর্বদেব শরীরজম্ ।
একস্থং তদভূন্নারী ব্যাপ্তলোকত্রয়ং ত্বিষা ॥ (২।৯।২৩)

দেবতাদের এই সব কথা শুনে বিষ্ণু ও মহেশ্বর কোপান্বিত হলেন এবং তাদের মুখ-মণ্ডলে ভ্রুকুটি দেখা দিল। তারপর কুপিত বিষ্ণুর, এবং পরে ব্রহ্মা ও মহেশ্বরের, মুখ থেকে মহাতেজ নির্গত হল। দেবগণ সেখানে দিগন্তব্যাপী জ্বলন্তপর্বতের মতো সেই তেজঃপুঞ্জ নিরীক্ষণ করলেন। সমস্ত দেবতার শরীর থেকে জাত সেই ত্রিলোকব্যাপ্ত দীপ্তি ও অতুলনীয় তেজ সংহত হয়ে এক নারীমূর্তী ধারণ করলো।

দেব-অস্ত্রে চণ্ডীর অস্ত্র সজ্জার বিবরণ নিম্নরূপ :

শূলং শূলাদ্ বিনিষ্কৃষ্য দদৌ তস্যৈ পিনাকধৃক্ ।
চক্রঞ্চ দত্তবান্ কৃষ্ণঃ সমুৎপাদ্য স্বচক্রতঃ ॥
শঙ্খঞ্চ বরুণঃ শক্তিং দদৌ তস্যৈ হুতাশনঃ ।
মারুতো দত্তবাংশ্চাপং বাণপূর্বে তথেষুধী ॥
বজ্রমিন্দ্রঃ সমুৎপাদ্য কুলিশাদমরাধিপঃ ।
দদৌ তস্যৈ সহস্রাক্ষো ঘণ্টামৈরাবতাদ্ গজাৎ ॥
কালদণ্ডাদ্ যমো দণ্ডং পাশাঞ্চাম্বুপতির্দদৌ ।
প্রজাপতিশ্চাক্ষমালাং দদৌ ব্রহ্মা কমণ্ডলম্ ॥
সমস্তরোমকূপেষু নিজরশ্মীন্ দিবাকরঃ ।
কালশ্চ দত্তবান্ খড়্গং তস্যাশ্চর্ম চ নির্মলম্ ॥
ক্ষীরোদশ্চামলং হারমজরে চ তথাম্বরে ।
চূড়ামনিং তথা দিব্যং কুণ্ডলে কটকানি চ ॥
অর্ধচন্দ্রং তথা শুভ্রং কেয়ূরান সর্ব্বাহুষু ।
নূপুর বিমলৌ তদ্বদ্ গ্রৈবেয়কমনুত্তম ॥
অঙ্গুরীয়করত্নানি সমস্তাস্বঙ্গুলীষু চ ॥

বিশ্বকর্মা দদৌ তস্যৈ পরশুঞ্চাতিনির্মলম্ ।
অস্ত্রাণ্যনেকরূপাণি তথাভেদ্যঞ্চ দংশনম্ ॥
অম্লানপংকজাং মালাং শিরস্যুরসি চাপরাম্ ।
অদদজ্জলধিস্তস্যৈ পংকজঞ্চাতিশোভনম্ ॥ (২০—২৮)

তারপর অন্যান্য দেবতারা তাঁকে আরো অলংকার ও আয়ুধ দিয়ে সজ্জিত করলেন এবং তখন দেবী অট্টহাস্য ও হুংকারে দিগ্‌দিগন্ত মুখরিত করলেন ঃ

অনৈরপি সুরৈর্দেবী ভূষণৈরায়ুধৈস্তথা ।
সম্মানিতা ননাদোচ্চৈঃ সাট্টহাসং মুহুর্মুহুঃ ॥
তস্যা নাদেন ঘোরেণ কৃৎস্নমাপূরিতং নভঃ ।
অমায়তাতিমহতা প্রতিশব্দো মহানভূৎ ॥
চুক্ষুভুঃ সকলা লোকাঃ সমুদ্রাশ্চ চকম্পিরে ।
চচাল বসুধা চেলুঃ সকলাশ্চ মহীধরাঃ ॥ (৩১-৩৩)

—অন্যান্য দেবগণ কর্তৃক ভূষণ ও আয়ুধে সজ্জিত হয়ে তিনি মুহুর্মুহু অট্টহাস্য ও গর্জন করতে লাগলেন। তাঁর অপরিমিত মহান্ ভীমগর্জনে সমগ্র নভোমণ্ডল পরিপূর্ণ হল এবং ভীষণ প্রতিধ্বনি সৃষ্টি করলো; সমস্ত ভুবন সংক্ষুব্ধ হল, যাবতীয় সমুদ্র কেঁপে উঠলো এবং পৃথিবী ও সমস্ত পর্বত বিচলিত হল। তুলনীয় ঃ

থর থর থরে মহী কাঁপিলা সঘনে
কল্লোলিয়া উথলিয়া সভয়ে জলধি ;
অধীর ভূধরব্রজ,—ভীমার গর্জনে—

দীর্ঘ নামের তালিকার ব্যবহার সর্ব শূরগাথা ও মহাকাব্যেরই বৈশিষ্ট্য ; এখানেও তা বেশ সার্থকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে।

চতুরংগে আইলা গর্জিয়া
চামর, অমর—ত্রাস ; রথীবৃন্দসহ
উদগ্র, সমরে উগ্র ; গজবৃন্দ মাঝে
বাস্কল, জীমূতবৃন্দ মাঝারে যেমতি
জীমূতবাহন বজ্রী ভীম বজ্র করে।
বাহিরিল হুহুংকারি অসিলোমা বলী

অশ্বপতি ; বিড়ালাক্ষ পদাতিক দলে,
মহাভয়ংকর রক্ষঃ দুর্মদ সমরে।

এখানে নামোল্লেখ ও বর্ণনায় ব্যক্তিত্ব স্থাপনের কোনও চেষ্টা নেই, অস্ত্রের ঝন্‌ঝনার মতো শুধু শব্দঝংকার ও শব্দচ্ছটা সৃষ্টি করে কবি সমরসজ্জায় বাতাবরণ সৃষ্টি করতে চান।

দীর্ঘ চিত্রকল্পের মধ্যে দৈত্যবাহিনীরূপে দেবী চণ্ডীর এই পুনর্জন্ম শাস্ত্রসম্মত নয়। শাস্ত্রকারগণ দেবাসুরের লড়াইকে সর্বদাই ন্যায় অন্যায় বা শুভাশুভের দ্বন্দ্ব বলে বর্ণনা করে থাকেন এবং তাঁরা দেখান যে দেব বা সুর সর্বদাই ন্যায় এবং অসুর সর্বদাই অন্যায়ের পক্ষে। মাইকেল মধুসূদন ভারতীয় রেনেসাঁসের নবীন ভাবধারায় উদ্দীপ্ত, ন্যায় অন্যায়ের এমন শাদাকালো বিচার তাঁর কাছে অগ্রাহ্য ; এই কাব্যে রামরাবণের সংঘর্ষকে তিনি তেমনভাবে চিত্রিত করেনও নি। অন্যায়ের মধ্যে ন্যায় এবং অশুভের মধ্যেও শুভ আছে ; এই শেক্সপিয়ারীয় বিশ্বদৃষ্টিকেই মধুসূদন লংকার মাটিতে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাই চণ্ডীকে তিনি অনায়াসেই রাক্ষসবাহিনীর সংগে একাত্ম করে দেখাতে পেরেছেন। দেব ও দৈত্য উভয়কেই তিনি মানুষের মতো বিচার করেছেন; দেবতাই হোক আর রাক্ষসই হোক মানুষের চেয়ে বড়ো কেউ নয়, বরং দেব, মানব ও রাক্ষসদের মধ্যে মানুষ হিসাবে কে বড়ো কে ছোটো তাই তিনি নানাভাবে দেখাতে চেষ্টা করেছেন। নিজ নিজ কর্মের মধ্যেই তারা ভালোমন্দ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে ; কোনো স্থায়ী চিহ্ন দিয়ে কবি কাউকেই সমালোচনার অযোগ্য করে রাখেননি। এই যুদ্ধসজ্জার মধ্যে কবি যেন রাবণপক্ষকেই ন্যায়ের পক্ষ বলে মনে করছেন এবং সে-জন্যই খুব অবলীলাক্রমে রাক্ষসবাহিনীর মধ্যে দানবদলনী চণ্ডীর মূর্তি দেখতে পাচ্ছেন। উনিশ শতকের ভারতীয় নবজন্ম বা রেনেসাঁসের ফলে এখানে চণ্ডীর এমন মূল্যবদল ও এমন অপ্রত্যাশিত পুনর্জন্ম সম্ভব হয়েছে। মধুসূদনের কল্পনা রাম ও রাবণ শিবিরের মধ্যে স্বচ্ছন্দগামী, এবং প্রায় আধুনিক চলচ্চিত্রের 'ফেইড আউট' 'ফেইড ইন' পদ্ধতিতে তিনি লংকার সমর সজ্জার বিবরণ দিতে দিতে—যেন অসমাপ্ত রেখেই, পাঠককে এক মুহূর্ত সময় না দিয়ে—একেবারে তৎক্ষণাৎ নাটকীয় চমকের মধ্যে চলে আসেন রাম ও বিভীষণের কথোপকথনের মধ্যে। রাক্ষসবাহিনীর ভীম

গর্জনে রাম যতোটা চমকে ওঠেন ঠিক ততোখানিই চমকে উঠি নিমেষের মধ্যে শিবিরান্তরিত আমরা, এইভাবে কথোপকথনের কিনারায় উপস্থিত হয়ে। কিন্তু কথোপকথনের মধ্যে সহসা নিক্ষিপ্ত হলেও কবি পাঠককে অব্যবহিত পূর্বে বর্ণিত প্রসংগের স্মৃতিভ্রংশ ঘটতে দেন না। তিনি এই সংলাপটি রচনা করেন একই দৃশ্যপট বা একই চিত্রকল্পের আংশিক পুনরাবৃত্তি ঘটিয়ে। এইমাত্র কবি লংকার সমরসজ্জার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন ঃ

থর থর থরে মহী কাঁপিলা সবলে ;
কল্লোলিলা উথালিয়া সভয়ে জলধি ;
অধীর ভূধরব্রজ—ভীমার গর্জনে,

এইবার রাম শুধু বিভীষণকে নয় পাঠককেও চোখে অঙ্গুল দিয়ে প্রলয়াত্মক ভূমিকম্পের ওই একই দৃশ্য একটু বিস্তারিত আকারে দেখাচ্ছেন ঃ

দেখ,
হে সখে, কাঁপিছে লংকা মুহুর্মুহুঃ দেখ, এবে
ঘোর ভূকম্পনে যেন। ধূমপুঞ্জ উড়ি
আবরিছে দিননাথে ঘন ঘন রূপে ;
উজলিছে নভস্থল ভয়ংকরী বিভা,
কালাগ্নিসম্ভবা যেন। শুন, কান দিয়া,
কল্লোল, জলধি যেন উথলিছে দূরে
লয়িতে প্রলয়ে বিশ্ব।

এখানে পূর্ববর্ণনায় যেটুকু বিস্তৃতি ঘটেছে তাও একেবারে নূতন নয়। পূর্বের ভূকম্প ও প্রলয় বর্ণনারই পরিপূরক পুনরুক্তি —

'শৃংগ নিনাদিল যেন, প্রলয়ের কালে, বাজাইলা শৃংগ বরে গম্ভীর নিনাদে!' এবং আমরা আগে এই ভূকম্পের চিত্রটি অবশ্য বীরভদ্রের লংকাবতরণের দৃশ্যে পেয়েছি ঃ

উতরিলা রথী—
রক্ষপুরে ; পদচাপে থর থর থরি
কাঁপিল কনকলংকা, বৃক্ষশাখা যথা
পক্ষীন্দ্র গরুড় বৃক্ষে পড়ে উড়ি যাবে।

এই সব বর্ণনা ও চিত্র কল্পের পুনরুক্তি কবির কাব্যকৌশলে পুনরুক্তি বলেই মনে হয় না। প্রথমে কবি ভূকম্পনের বর্ণনা করলেন, তারপর সেই ভূকম্পন দৃশ্যই রাম বর্ণনা করলেন, তখন আবার বিভীষণ রামের প্রত্যুত্তরে ভূকম্পনের কারণ নির্দেশ করতে গিয়ে সেই একই দৃশ্যই বর্ণনা করেছেন ঃ

কি আর কহিব, দেব ? কাঁপিছে এ পুরী
রক্ষোবীরপদভরে, নহে ভূকম্পনে।
কালাগ্নি সম্ভবা বিভা নহে যা দেখিছ
গগনে, বৈদেহীনাথ ; স্বর্ণবর্ম—আভা
অস্ত্রাদির তেজঃ সহ নিশি উজলিছে
দশ দিশ। রোধিছে যে কোলাহল, বলি,
শ্রবণকুহর এবে, নহে সিন্ধু ধ্বনি ;
গরজে রাক্ষস চমূ মাতি বীরমদে।

যেন ভিন্ন ভিন্ন সমালোচক একই কাব্যাংশের নিজ নিজ ভাষ্য দিয়ে চলেছেন। এদের মধ্য থেকেই পাঠকও তার নিজের পছন্দমতো দৃশ্য ও তার মনোমত ভাষ্য রচনা করে নিতে পারবেন। এই প্রসঙ্গে আরো একটি জিনিস আমরা লক্ষ্য করি, সেটি হচ্চে কোনো বিশেষ চিত্রকল্প বা থীমকে পুনরাবৃত্ত করতে করতে কবি অনেকদূর পর্যন্ত নিয়ে যান যাতে পাঠকের মনে সেটি একটি স্থায়ী আসন অধিকার করে নিতে পারে। সপ্তমসর্গে সেই চিত্রকল্প বা থীম হচ্ছে ভূকম্প ও প্রলয়। আকিলেসের ক্রোধের মতো রাবণের নাশংকর ক্রোধও সমগ্র পরিস্থিতির আমূল পরিবর্তন ঘটাতে উদ্যত। রাবণের এই বিপুলায়তন বিনাশী ক্রোধকে রূপ দেবার জন্যই কবি এই সর্গে ভূমিকম্প ও প্রলয়ের থীমটি বহুদূর পর্যন্ত টেনেছেন। লক্ষ্মীদেবীর উত্তরে ইন্দ্রও বলবেন ঃ

দেব রক্ষোরণে
(দুর্জয় উভয় কুল) কে জানে কি ঘটে ?
হয়ত মজিবে মহী, প্রলয়ে যেমতি,
আজি; এ বিপুল সৃষ্টি যাবে রসাতলে।

এবং তারপর আবার,

ডুবিল তিমিরপুঞ্জে তিমির-বিনাশী
দিনমনি ; বায়ুদল বহিলা চৌদিকে
বৈশ্বানরশ্বাসরূপে ; জ্বলিল কাননে
দাবাগ্নি ; প্লাবন নাদি গ্রাসিল সহসা
পুরী, পল্লী; ভূকম্পনে পড়িল ভূতলে
অট্টালিকা, তরুরাজী ; জীবন ত্যজিল
উচ্চ কাঁদি জীবকুল, প্রলয়ে যেমতি।

এবং তারপর প্রলয় ও দশাবতার চিত্রকল্পের ব্যবহার করে মহীর উক্তি ঃ

কূর্ম'পৃষ্ঠে তিষ্ঠাইলা দাসীরে প্রলয়ে
কূর্ম'রূপে, বিরাজিনু দশন শিখরে
আমি (শশাঙ্কের দেহে কলঙ্কের রেখা—
সদৃশী) বরাহমূর্তি ধরিলা যে কালে,
দীনবন্ধু। নরসিংহবেশে বিনাশিয়া
হিরণ্যকশিপু দৈত্যে, জড়ালে দাসীরে।
খর্বিলা বলির গর্ব খর্বাকারছলে,
বামন। বাচিনু প্রভু তোমার প্রসাদে।

অসম্বৃত ক্রোধে উদ্দীপ্ত রাবণের নিজের সিংহাসন ও জীবন উভয়ই যে দোলায়িত তা ভূকম্পিত লংকার অস্থিরতার মধ্যেই আভাসিত হয়ে উঠছে।

দীর্ঘনামাবলীর ব্যবহার শূরগাথা ও মহাকাব্যের একটি বহু-ব্যবহৃত বৈশিষ্ট্য, একথা আমরা আগেই বলেছি। রাক্ষসদলের নামের তালিকা কবি আগেই দিয়েছেন। এখন রামচন্দ্রের দলভুক্ত বীর সেনানীদের তালিকা দাখিল করছেন ঃ

আইলা কিস্কিন্ধ্যানাথ গজপতিগতি
রণবিশারদ শূর অংগদ ; আইলা
নল, নীল দেবাকৃতি ; প্রভঞ্জন সম
ভীমপরাক্রম হনূ ; জাম্বুবান বলী;
বীরকুলর্ষভ বীর শরভ ; গবাক্ষ
রক্তাক্ত, রাক্ষসত্রাস ; আর নেতা যত।

মিল্‌টনের প্যারাডাইস লস্ট মহাকাব্যেও দীর্ঘ এবং দীর্ঘতর নামাবলী রয়েছে। কিন্তু মিল্‌টনের মহাকাব্যে আসন্ন যুদ্ধের ঝটিকাগতি না থাকায় সেখানে বিবৃতি

অনেক মন্থর এবং চরিত্রচিত্রণ অনেক বিস্তারিত। মিটল্‌ন নিজেই বাগ্‌দেবীর কাছ থেকে শয়তানের অনুগামীদের নাম জানতে চেয়ে বলেছন :

Say, Muse, their names then known, who first, who last,
Roused from the slumber, on that fiery couch,
At their great emperor's call, as next in worth
Came singly when he stood on the bare strand
While the promiscuous crowd stood yet aloof.

(Paradise Lost, Bk. I, 376-80)

মিল্‌টনের তালিকায় বিশিষ্টদের মধ্যে আছে Moloch, Chemos, Astoreth, Thammuz, Dagon, Rimmon, Belial. মধুসূদন যেখানে মাত্র ছ'টি লাইনে সাতজন বীরের নাম করেছেন, মিল্‌টন সেখানে উপরোক্ত সাত জনের বিবরণ দিয়েছেন শতাধিক লাইনে, এবং প্রাচীন পুরাণ কাহিনী থেকেও নানা প্রসংগ এনে যুক্ত করেছেন। যদিও কাহিনীর পশ্চাৎপট সম্পূর্ণ আলাদা, তবু মিল্‌টনের নামাবলী বা চরিত্রাবলী অনেকটা চসারের ক্যাণ্টারবেরি টেইলসের প্রারম্ভে বর্ণিত তীর্থযাত্রীদের মতো। মধুসূদনে চসারের ধরনে চরিত্রচিত্রণের অবকাশ নেই, বা মিল্‌টনের ধরনে পুরাণ কাহিনী চর্বনের তাগিদও অনুপস্থিত। তিনি এক একটি বিশেষণেই এক একটি চরিত্রচিত্রণ শেষ করেছেন। রাবণের ক্রোধ যেখানে দপ্‌ করে জ্বলে উঠেছে সেখানে সমগ্র যুদ্ধোদ্যমেই সেই দ্রুততা ও সেই ব্যস্ততা দেখানো আবশ্যিক বলে কবি মনে করেছেন। মিল্‌টনের চরিত্রগুলি যেখানে স্থিরচিত্র, মাইকেলের সেখানে অস্থিরচিত্র। Moloch—এর চরিত্রটি উপস্থিত করতে গিয়ে মিল্‌টন দীর্ঘ পাঁচ লাইন পর প্রথম পূর্ণচ্ছেদে এসে পৌঁছেছেন; কিন্তু সেখানেও না থেমে তিনি একটি সম্পূর্ণ উপ-পুরাণ রচনায় মনোযোগী হয়ে আরো ন'টি লাইন নির্মান করেছেন :

First Moloch, horrid king besmeared with blood
Of human sacrifice, and parents' tears,
Though for the noise of drums and timbrels loud

Their children's cries unheard, that passed through fire
To his grim idol. Him the Ammonite
Worshipped in Rabba and her wat'ry plain,
In Argob and in Basan, to the stream
Of utmost Arnon. Nor content with such
Audacious neighbourhood, the wisest heart
Of Solomon he led by fraud to build
His temple right against the temple of God
On that opprobrious hill, and made his grove
The pleasant valley of Hinnom, Tophet thence
and black Gehenna called, the type of hell.

(392-405)

মাইকেলের পক্ষে প্রথম দুটি লাইনই যথেষ্ট হত, কিন্তু মিল্‌টন যেহেতু এই সব 'ভগ্ন' দেবদূতদের এখনই কোনো যুদ্ধ সাজে সজ্জিত করছেন না, অতএব তাদের বিস্তৃত কুলপঞ্জীতে সময় ব্যয় করতে তাঁর কোনা আপত্তি নেই। অবশ্য মিল্‌টনের এই নামাবলী রচনার রীতি মিল্‌টনের অনেক আগে ভার্জিলই স্থির করে দিয়ে গিয়েছিলেন। ঈনিদ মহাকাব্যের ৭ম সর্গে ভার্জিলও প্রথমে বাগ্‌-দেবতাদের কাছে প্রার্থনা করেই নামাবলী রচনায় ব্রতী হয়েছেন ঃ

Open up Helicon now, you Muses of song ;
Inspire me to tell what kings were aroused to war,
What armies each had behind him, filling the plains,
What was the flower of manhood that even then
Bloomed in the bounteous earth of Italy ; what
Was the blaze of armour there ; full well you remember,
For you are divine, and you can recount it ; to us
Scarcely a breath of that story blows faint through
the years.

তারপর ঠিক মিল্‌টনের প্যারাডাইস লস্টে যেমন দেখেছি তেমনি ভাবেই একের পর এক যোদ্ধাদের নামও বর্ণনা দিয়ে গেছেন ভার্জিল ; মিল্‌টনের মতোই তিনি বর্ণনায় অনেকটা শ্লথগতি এবং ব্যাপ্তিপ্রিয়। আরম্ভেই—

The first to enter the war and arm his people
Was a bitter man and one that despised the gods,

Mezentius, come from the Tuscan shore ; at his side
Was his son, Lausus, most handsome of all men born
Save only Laurentine Turnus, more comely of form ;
Lausus, the tamer of horses and hunter of game.

Mezentius ও Lausus-এর পর ক্রমে Aventinus, Catillus, Coras, Caeculus, Messapus ইত্যাদির বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, এবং এখানেও দেখি সাত জন বীরের বর্ণনা দিতে ভার্জিল প্রায় সত্তর লাইন ব্যয় করেছেন। ভার্জিল এই নামাবলী রচনার কৌশলটি পেয়েছিলেন হোমরের কাছ থেকে। হোমরের ইলিয়াদ মহাকাব্যের দ্বিতীয় সর্গের অর্ধেক জুড়ে রয়েছে রণপোত ও রণবীরদের তালিকা ও বর্ণনা, এবং সেখানেও মহাকবি বাগ্‌দেবতাদের প্রসাদ প্রার্থনা করেই বর্ণনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন :

And now 0 Muses, dwellers, in the mansions of Olympus,
tell me—for you are goddesses and are in all places
so that you see all things, while we know nothing but by
report—who were the chief and princes of the Danaans ?
As for the common soldiers, they were so many that I
could not name every single one of them though I had
ten tongues, and though my voice failed not and my heart
were of bronze within me, unless you, O Olympian Muses,
daughters of aegis-bearing Zeus, were to recount them to
me. Nevertheless, I will tell the captains of the ships
and all the fleet together,

(Iliad, II, 486)

মাইকেল মধুসূদন, হোমর, ভর্জিল বা মিল্‌টনের অন্ধ অনুকারক নন, তিনি সচেতন মহাশক্তিধর, প্রতিভাবান এক কবি। তাঁর একমাত্র আনুগত্য নিজের শিল্পের প্রতি। তাই তিনি সপ্তম সর্গের কেন্দ্র—রাবণের ক্রোধ—থেকে একটুও বিচ্যুত হতে রাজী নন, এবং এই কেন্দ্রকে প্রয়োজনের আগে একটুও দুর্বল হতে দিতে পারেন না। যুদ্ধোদ্যমের সমগ্র পরিকল্পনাটি রাবণের এই ক্রোধাত্মাকে রূপ দেবার জন্যই। হোমার বা ভর্জিলে বাইরের বর্ণনাতেই নামাবলী সম্পূর্ণ; সেখানে শূরগণ স্বভাবতই শৌর্যবান, তাদের কীর্তিকাহিনীও সবই পৌরাণিক। মিল্‌টনেও

পৌরাণিক কাহিনীর ব্যবহার প্রায় একই রকম। কিন্তু একটু তফাৎ এই যে, মিল্‌টনের বর্ণনায় পঞ্জীভুক্ত ভগ্নদেবদূতগণের চরিত্রের ব্যক্তিগত নৈতিক দিকটির প্রতিও বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। মাইকেল মধুসূদন মিল্‌টনের এই বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে সজাগ থাকলেও তাঁর মেঘনাদবধকাব্যে বীরদের নৈতিক চরিত্রায়ণের খুব সুযোগ নেই। তিনি বরং প্রাচীনতর মহাকাব্যের মতোই শূরদের শৌর্যেরই শুধু উল্লেখ করেছেন কিন্তু বাদ দিয়েছেন বীর আখ্যানাবলী।

তবু লক্ষণীয়, তৃতীয় সর্গের চিত্রণ থেকে সপ্তম সর্গে রামানুবর্তী বানর সৈন্যদের চিত্রণ স্বতন্ত্র এবং অনেক বেশি সমুন্নত। প্রমীলার সহযোদ্ধ্রী নৃমুণ্ডমালিনী তৃতীয় সর্গে হনুমানকে সম্বোধন করে বলেছিলেন :

শীঘ্র ডাকি আন্ হেথা তোর সীতানাথে,
বর্বর, কে চাহে তোরে, তুই ক্ষুদ্রজীবী।
নাহি মারি অস্ত্র মোরা তোর সমজনে
ইচ্ছায়। শৃগাল সহ সিংহী কি বিবাদে ?
দিনু ছাড়ি, প্রাণ লয়ে পালা বনবাসি।

রাবণের উদ্রিক্ত ক্রোধের সামনে এরূপ প্রতিপক্ষ খাড়া করলে তা হত কমিক ও নিতান্ত হাস্যকর, তাতে সপ্তম সর্গের এপিক মর্যাদা বজায় থাকতো না। বন্ধু রাজনারায়ণ বসুকে লিখিত পত্রে, মধুসূদন এই সমস্যা সম্বন্ধে কতোটা সজাগ ছিলেন তা বুঝা যায়। তিনি লিখেছিলেন : "The subject is truly heoric, only the Monkeys spoil the jocke—but I shall look to them." অন্যত্র তিনি বলেছিলেন : "By the bye, if the father of our poetry had given Rama human companions, I could have made a regular Iliad of death of Meghnad.

সপ্তম সর্গে বানরসৈন্যেরা কেউই বানরাকৃতি নয়, "নলনীল দেবাকৃতি"; হনুমান ও জাম্বুবানও রাক্ষসদের সমযোদ্ধা, "প্রভঞ্জনসম/ভীমপরাক্রম হনূ; জাম্বুবান বলী," এবং সকলেই "রাক্ষসত্রাস"।

মধুসূদন বীরদের নামের তালিকা ব্যবহার করবার সময় আখ্যায়িকাত্মক পৌরাণিক উল্লেখ সযত্নে পরিহার করেছেন (যদিও এখানে তা খুবই সহজ

ছিল), কারণ তাতে পাঠক অন্যমনস্ক হয়ে পড়তেন এবং আসন্ন ভয়ংকর সম্ভাবনার বোধটি দুর্বল হয়ে পড়তো। এখানে মধুসূদন ইচ্ছাকৃতভাবেই তাঁর রীতিকে বর্ণনাপ্রধান না রে করে, তুলেছেন নাট্যপ্রধান। রাম ও রাবণ পক্ষ যে শৌর্যে ও পরাক্রমে সমান সমান, এই ভাবটি ফুটিয়ে তুলবার জন্যই উপরে উদ্ধৃত উভয় পক্ষের নেতৃস্থানীয় বীরদের নামাবলী কবি ৬।৭ লাইনের প্রায় সমদৈর্ঘ্যে আবদ্ধ রেখেছেন। উভয় দিকের বর্ণনাতেই একই ধরনের ক্ষিপ্রতা ও সংক্ষিপ্ততা দুপক্ষের মধ্যে একটি শক্তি-সাম্যের ভাব ফুটিয়ে তুলেছে। 'রাবণের ক্রোধ' দুর্বল প্রতিপক্ষের প্রতি সবলের ক্রোধ না হয়ে সমান বলী প্রতিপক্ষের প্রতি ক্রোধ হিসেবে যাতে ফুটে উঠতে পারে, কবি সে-বিষয়ে বিশেষ যত্নবান। এরপর স্বয়ং ইন্দ্রের মুখে আমরা শুনবো ঃ

দেবরক্ষোরণে,
(দুর্জয় উভয়কুল) কে জানে কি ঘটে ?—
হয়তো মজিবে মহী, প্রলয়ে যেমতি,

ইলিয়াদে যেমন আকিলেসের ক্রোধ, মেঘনাদবধকাব্যেও তেমনি রাবণের ক্রোধ ; উভয়ক্ষেত্রেই ক্রোধের ভিয়াণে মূল এপিক রস জ্বাল দেওয়া হয়েছে।
পেশী ও অস্ত্রবলে উভয়পক্ষের মধ্যে শক্তি-সাম্য দেখানো হয়েছে বটে, কিন্তু মহাযোদ্ধাদের প্রতি রামের ভাষণটি একেবারেই অ-বীরোচিত। রামের দুর্বল-চিত্ততা ও তাঁর মধ্যে সহজাত নেতৃত্বশক্তির অভাব কবি ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর ভাষায়। যুদ্ধোদ্যমের বর্ণনা ও ধ্বনিতে যে ব্যঞ্জন-সংঘর্ষ, তা রামচন্দ্রের ভাষণে রীতিমতো অনুপস্থিত ঃ

তোমরা সকলে
ত্রিভুবনজয়ী রণে, সাজ ত্বরা করি ;
রাখ গো রাঘবে অজি এ ঘোর বিপদে।

দুর্বলচেতা রামের এই ভাষা-দৌর্বল্য রাবণের রোষাগ্নি-প্রসূত পৌরুষ-বচনের কাছে একেবারেই নিষ্প্রভ। কোথায় তিনি তাঁর অনুগামীদের মনে সাহস যোগাবেন, তা না নিজেই ছিঁচকাদুনি গাঁইছেন ঃ

স্ববন্ধু বান্ধবহীন বনবাসী আমি
ভাগ্যদোষে ; তোমরা হে রামের ভরসা,

রামের অনুগামী সৈন্যদল রামের ভাষণের পর 'জয়রাম' শব্দে আকাশবাতাস কাঁপিয়ে তুললো। লংকার রাক্ষসবাহিনীও গম্ভীর আওয়াজে তার প্রত্যুত্তর দিল :

সে ভৈরব রবে রুষি, রক্ষঃ অনীকিনী
নিনাদিলা বীরমদে, নিনাদেন যথা
দানবদলনী দুর্গা, দানব নিনাদে—
পূরিল কনকলংকা গম্ভীর নির্ঘোষে।

আমরা একটু আগেই দেখেছি চিত্রকল্পের মধ্যে রাক্ষস-অনীকিনীর সংগে চণ্ডীর একাত্মতা দেখিয়ে কবি প্রচলিত ভালোমন্দের বিপরীত ধারণাই সৃষ্টি করতে চেয়েছেন। এখানেও সেই একই ব্যঞ্জনা তিনি সৃষ্টি করেছেন রক্ষঃ-অনীকিনীর সঙ্গে দানবদলনী দুর্গার একত্মতা দেখিয়ে। চণ্ডীর 'মহিষাসুর বধ' নামক অধ্যায় থেকে এই চিত্রকল্পটি গৃহীত হয়েছে। মহিষাসুরের সেনাপতি চামরাসুর দেবী দুর্গার প্রতি শক্তি নামক অস্ত্র নিক্ষেপ করলে দেবী তাকে তৎক্ষণাৎ তাঁর হুংকারে প্রতিহত ও নিষ্প্রভ করে ভূপাতিত করলেন :

সোঽপি শক্তিং মুমোচাথ দেব্যাস্তামম্বিকা দ্রুতম্।
হুংকারাভিহতাং ভূমৌ পাতয়ামাস নিষ্প্রভাম্ ।। (৩। ১২)

দুর্গা দানবদলনী, কিন্তু এখানে দানব বা রাক্ষসদলের হুংকারের সংগে তাঁর হুংকারের একাত্মতা দেখানো হয়েছে ; এখানেও কবি বলতে পারতেন, 'পুনঃ যেন জন্মি দুর্গা নিনাদিল রোষে।' দানবশক্তিকে কবি এইভাবে বারবার দেবতার শক্তির সংগে এক করে দেখেছেন। দেব ও দানব এই দুই শিবিরকে যে শুভ ও অশুভ এই রকম শাদাকালো দাগে ভাগ করা যায় না, এটি বলাই কবির অভিপ্রেত মনে হয়।

লংকার চূড়ান্ত সংগ্রামের প্রস্তুতি চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে, লক্ষীদেবীর কানে সেই মত্ত আবার এসে পৌঁছেছে :

দেখিলা পদ্মাক্ষী রক্ষঃ সাজিছে চৌদিকে
ক্রোধান্ধঃ রাক্ষসধ্বজ উড়িছে আকাশে,

জীবকুল-কুলক্ষণ। বাজিছে গম্ভীরে
রক্ষোবাদ্য। শূন্য পথে চলিলা ইন্দিরা
শরদিন্দু নিভাননা—বৈজয়ন্তধামে।

লক্ষ্মীদেবী ছুটেছেন ইন্দ্রের সভায়। মহাকাব্যে পারাতাক্‌সিস রীতির উদাহরণ আমরা আগেই দিয়েছি। এখানেও দেখি পাঠকের সরাসরি প্রত্যক্ষণের সুবিধার জন্য কবি পারাতাক্‌সিস স্টাইলের অনুষংগে ভুতকালকেও বর্তমান কালের মধ্যে টেনে নামিয়েছেন। ইন্দ্রের সভায় তখন—নাচগান চলছে :

বাজিছে বিবিধ বাদ্য ত্রিদশ-আলয়ে ;
নাচিছে অপ্সরাবৃন্দ ; গাইছে সুতানে
কিন্নর ; সুবর্ণাসনে দেবদেবীদলে
দেবরাজ, বামে শচী সুচারু হাসিনী,
অনন্ত বাসন্তানিল বহিছে সুস্বনে ;
বর্ষিছে মন্দারপুঞ্জ গন্ধর্ব চৌদিকে।

এখানেও লক্ষনীয়, সংযোজক অব্যয়ক্রিয়া একটিও ব্যবহৃত হয়নি। আরো একটি জিনিশ লক্ষণীয়। কবি যেন এক নিঃশ্বাসে একই গতি ও লয়ে মর্ত্যে ও স্বর্গে যথাক্রমে যুদ্ধ ও শান্তির বর্ণনা দিয়েছেন। একই সময়ে যখন 'বাজিছে গম্ভীরে রক্ষোবাদ্য' তখনই 'বাজিছে বিবিধ বাদ্য ত্রিদশ আলয়ে'। চলচ্চিত্রে 'ফেইড-আউট' ও 'ফেইড-ইন' প্রয়োগ হয় দৃশ্যের বেলায়, মাইকেল এখানে 'ফেইড-আউট' ও 'ফেইডইন'—এর প্রয়োগ করেছেন শব্দের উপর। যুদ্ধের শংকিত প্রতিধ্বনি মিলাতে না মিলাতে, যেন সেই ধ্বনির উপরই ধ্বনিত হয়ে উঠেছে স্বর্গ-সভার নিঃশংক নৃত্যগীতের ধ্বনি। দুটি বিপরীত চিত্র এইভাবে রুদ্ধশ্বাস লক্ষ্মীর উদ্বেগের মধ্যে একাকার হয়ে গেছে। মনস্তাত্ত্বিক বিচারে বলা যায়, যেন লক্ষ্মীদেবীর কানে স্বর্গসভার মধুর বাদ্যও মর্তের যুদ্ধবাদ্য থেকে পৃথকভাবে অনুভূত হচ্ছে না, এবং কবি সেই সমানুভূতির ব্যঞ্জনাই ফুটিয়ে তুলেছেন ধ্বনি ও লয়ের সমতায়। প্রথম অংশের প্রথম দিকে 'চৌদিকে' এবং শেষদিকে 'বাজিছে' পদ দুটি ব্যবহৃত হয়েছে ; দ্বিতীয় অংশে এই ক্রম উলটিয়ে প্রথমে 'বাজিছে' এবং শেষে 'চৌদিকে'। ইংগিতটি বেশ সূক্ষ্ম ও শিল্প-সম্মত। মর্ত্যের উলটো পিঠ স্বর্গ,

যুদ্ধের উলটো পিঠ শান্তি ; বিপরীত দিক থেকে এসে একই রামরাবণের সংঘর্ষের এরা শরিক। অবশ্য শ্রী-সম্পদের দেবী লক্ষ্মী এসেছেন শান্তির পরিবর্তে ষড়যন্ত্র ও যুদ্ধের দূতিয়ালিতে, একটি বিরাট ষড়যন্ত্রের নায়িকা হিসেবে ; এটি ভারতীয় পুরাণে অভ্যস্ত পাঠকদের কাছে খুব সহজে গ্রহণীয় হতে পারে না। লক্ষ্মীর এধরনের ডিপ্লম্যাটিক ভূমিকা আমাদের অপরিচিত। লক্ষ্মী চঞ্চলা আমরা জানি, কিন্তু তিনি যে দূতী, এবং তিনি যে গ্রীক মারকারি বা হের্‌মেসের মতো 'swift-footed' বা দ্রুতপদী তা আমরা জানি না। মধুসূদনের মধ্যে লক্ষ্মী নবজন্ম ও নবকলেবর ধারণ করেছেন। মাইকেল হিন্দুপুরাণকে গ্রীক্‌পুরাণের মতো ব্যবহার করেছেন ; উদ্দেশ্য, গ্রীক মহাকাব্যের ওজস্বিতা ও মানিবকতা তাঁর মহাকাব্যে সঞ্চারিত করা। লক্ষ্মীর লক্ষ্মীত্ব এতে নিঃসন্দেহে খর্ব হয়েছে, কিন্তু পৌরাণিক লক্ষ্মীর চেয়ে তিনি চরিত্র হিসেবে একটু বেশি জটিলা হয়েছেন সন্দেহ নেই! লক্ষ্মী, রাম ও রাবণ কখন কার দিকে, তা যেন তিনি নিজেও জানেন না ; তাঁর এই অস্থিরতা ও অসামঞ্জস্য দেবতাদের সাধারণ কাপুরুষতারই অনুরূপ। লক্ষ্মী এখানে নীতি পরিত্যাগ করে গ্রহণ করেছেন কূটনীতি এবং রূপান্তরিত হয়েছেন কুটিলায়। লক্ষ্মীকে কবি যে দেবী থেকে মানবীতে পরিণত করেছেন তার আরো একটি প্রমাণ আমরা পাই কবি কর্তৃক লক্ষ্মীকে 'সুন্দরী' এই অপ্রত্যাশিত মানবী-সুলভ বিশেষণ প্রয়োগে : 'যতদূর চলে দেবদৃষ্টি, দৃষ্টিদানে হেরিলা সুন্দরী···' লক্ষ্মীর দৃষ্টিকে দেবদৃষ্টি বলা হচ্ছে, কিন্তু লক্ষ্মীর প্রতি কবির দৃষ্টি যে আলাদা, তা স্পষ্ট। লক্ষ্মীর schizophrenic বা দ্বিধাবিভক্ত ব্যক্তিত্ব অপৌরাণিক এবং আধুনিক। মনে হয় তিনি রাবণের জয় ও পরাজয় কোনটিতেই পুরোপুরি সায় দিতে পারছেন না। রাবণ জয়ী হবে এই ভয়ে তিনি ছুটে গেছেন ইন্দ্রের কাছে, আবার রাবণ পরাজিত হবে এই ভেবে তিনি বিষন্ন ও বিরসবদনা :

পশি স্বমন্দিরে,
বিষাদে কমলাসনে বসিলা কমলা,—
আলো করি দশ দিশ রূপের কিরণে,
বিরস বদন, মরি, রক্ষঃকুল দুখে।

তাঁর মানসিক দ্বিধার কথা মনে রেখেই যেন কবি তাঁর বর্ণনার মধ্যে ইচ্ছা করেই একটি স্ববিরোধ স্থাপন করেছেন। অন্যথায় 'বিষাদ' 'বিরসবদন' এবং 'দুঃখ' এর সংগে 'আলো করি দশ দিশ' এর প্রয়োগ কিছুতেই সংগত হয় না।

ইন্দ্র স্বর্গের উত্তরদিকে প্রস্তুত দেবসৈন্যদের দেখিয়ে লক্ষ্মীকে আশ্বস্ত করেছেন, প্রয়োজন হলে তাঁর সৈন্যগণ রাবণকে প্রতিহত করবে। দেবসৈন্যই হোক আর রাক্ষসসৈন্যই হোক তাদের প্রস্তুতি, আক্রম এবং আকৃতি একই রকম, উভয়েরই কাজ বিধ্বংস করা, উভয়ের জন্যই তাই একই প্রলয়ের চিত্রকল্প কবি ব্যবহার করেছেন। রাক্ষসচমূর প্রসংগে প্রলয়াগ্নি ও ধূম্রপুঞ্জের কথা আগেই বলা হয়েছে। বাসবীয় চমূ প্রসংগেও কবি এখন প্রলয়াগ্নি ও ধূম্রপুঞ্জের চিত্রকল্প প্রয়োগ করছেন :

বাসবীয় চমূ রমা দেখিলা চমকি
স্বর্গের উত্তর ভাগে। যতদূর চলে
দেবদৃষ্টি, দৃষ্টিদানে হেরিলা সুন্দরী
রথ, গজ, অশ্ব, সাদী, নিষাদী, সুরথী,
পদাতিক যমজয়ী, বিজয়ী সমরে।
গন্ধর্ব, কিন্নর, দেব, কালাগ্নি-সদৃশ
তেজে ; শিখীধ্বজ রথে স্কন্দ তারকারি
সেনানী, বিচিত্র রথে চিত্ররথ রথী।
জ্বলিছে অম্বর যথা বন দাবানলে ;
ধূমপুঞ্জ সম তাহে শোভে গজরাজী

রাক্ষসচমূর বর্ণনা রামের মুখে আমরা আগেই শুনেছি :

ধূমপুঞ্জ উড়ি
আবরিছে দিননাথে ঘন ঘন রূপে ;
উজলিছে নভঃস্থল ভয়ংকরী বিভা,
কালাগ্নিসম্ভবা যেন।

মহাকাব্যের প্রধান পটভূমি যুদ্ধ এবং মহাকাব্যের মধ্যে যুদ্ধের বর্ণনা প্রায় আবশ্যিক। কিন্তু মহাকবিরা মূলত যুদ্ধের নয়, শান্তির কবি। যুদ্ধের বাস্তব চিত্র রচনায়

তাঁরা পরাঙ্মুখ নন, কিন্তু তাঁরা কেউই যুদ্ধবাদী নন, যুদ্ধের বিভীষিকার কথা তাই পাঠকের কাছে তাঁরা মাঝে মাঝেই তুলে ধরেন। ইন্দ্রের মুখ দিয়ে কবি তাই বলাচ্ছেন: "দেবরক্ষোরণে,/দুর্জয় উভয় কুল কে জানে কি ঘটে?—/হয়ত মজিবে মহী, প্রলয়ে যেমতি/আজি; এ বিপুল সৃষ্টি যাবে রসাতলে।"

সপ্তম সর্গে রাবণ বিজয়ী বীর। মেঘনাদবধ কাব্যের প্রথম সর্গে একবার পুত্র বীরবাহুর মৃত্যুর শোধ নিতে রাবণ রণসাজে সেজেছিলেন, কিন্তু পুত্র মেঘনাদ বাধা দেওয়ায় সেবার যুদ্ধ যাত্রা স্থগিত রাখতে হয়েছিল। এখন মেঘনাদও নিহত, এবার রাবণ আবার পুত্রহত্যার প্রতিশোধ নিতে রণসাজে সজ্জিত হয়েছেন। সপ্তম সর্গে এই যুদ্ধসজ্জার বর্ণনার মধ্যে প্রথম সর্গের যুদ্ধ-বর্ণনার দূরাগত, কিন্তু সুস্পষ্ট প্রতিধ্বনি আমরা শুনতে পাচ্ছি। এখানে:

রণমদে মত্ত, সাজে রক্ষঃকুলপতি;
হেমকুট-হেমশৃংগ-সমোজ্জ্বল তেজে
চৌদিকে রথীন্দ্রদল। বাজিছে অদূরে
রণবাদ্য; রক্ষোধ্বজ উড়িছে আকাশে,
অসংখ্য রাক্ষসবৃন্দ নাদিছে হুংকারে।

প্রথম সর্গে:

সাজিছে রাবণ রাজা; বীরমদে মাতি
বাজিছে রণ-বাজনা; গরজিছে গজ;
হ্রেষে অশ্ব; হুংকারিছে পদাতিক, রথী;
উড়িছে কৌশিক ধ্বজ; উঠিছে আকাশে
কাঞ্চন কঞ্চুক-বিভা।

শুধু যুদ্ধের বর্ণনায় নয়, স্বয়ং রাবণের চিত্রকল্পরচনায়ও কবি ফিরে গেছেন প্রথম সর্গের মনোভূমিতে। সেই শোক, সেই শৌর্য, সেই সমুন্নত মহিমা। সপ্তম সর্গে রক্ষঃ কুলপতি "হেমকুট-হেমশৃংগ-সমোজ্জ্বল তেজে।" আর প্রথম সর্গে বলী দশানন "হেমকুট-হৈমশিরে শৃংগবর যথা তেজঃ পুঞ্জ।" একটি অপরটির প্রায় কার্বনকপি। প্রথম ও সপ্তম উভয় সর্গেরই সমগ্র ভার ধারণ করে আছেন রাবণ। এই ভার শোক ও শৌর্য উভয়ের। স্বর্ণচূড়গিরির চিত্রকল্পটি—যে কবি

উভয় সর্গেই ব্যবহার করেছেন তা অকারণে নয়। মেঘনাদবধকাব্যের একেবারে প্রথমেই মধুসূদন রাবণকে এপিক সু-উচ্চ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছেন। শুধু এপিক নায়কেরই নয়, ট্রাজিক নায়কেরও। রাবণের মধ্যে ক্লাসিক ও রোমান্টিক আদর্শের এক সুন্দর সমন্বয় এইভাবে ঘটেছে। এপিক নায়কের মত তিনি জাতি ও গোষ্ঠির গৌরব ও গ্লানির সংগে একাত্ম, সমষ্টির নেতা ; আবার রোমান্টিক নায়কের মতো তিনি তাঁর ব্যক্তিগত শোক ও দুঃখে একাকী, অসামান্য প্রতিভায় অনন্য ও অত্যুচ্চ। আধুনিক চলচ্চিত্রের ভাষায় রাবণের বিরাটত্ব বুঝাবার জন্যই রাবণের 'ক্লোজ আপ' ফুটিয়ে তুলেছেন মধুসূদন। রাবণ প্রথম সর্গের উপর যে প্রবল অসপত্ন আধিপত্য স্থাপন করে দাঁড়িয়ে আছেন তার মহিমা শুধু আধুনিক চলচ্চিত্রেই কিছুটা রূপায়িত হওয়া সম্ভব। কবি সেখানে রাবণের স্থিরচিত্র গ্রহণ করেই তুষ্ট থাকেননি। তাঁর কাব্যের ক্যামেরা রাবণের অস্থির পদচারণাকেও সম্ভ্রমে অনুসরণ করেছে। কবি রাবণকে প্রাসাদশিখরে উঠিয়েছেন, শুধু দূর থেকে রাবণ বীরবাহুর মৃতদেহ নিরীক্ষণ করবেন বলেই নয়, সেই উচ্চতলে দণ্ডায়মান রাবণকেও কবি দৃষ্টিগোচর করবেন এবং করাবেন বলেই। "দেখিলা রাক্ষসেশ্বর উন্নত প্রাচীর অটল / অচল যথা" (১ম সর্গ)। এই উন্নত প্রাচীরের চেয়েও অনেক উচুঁতে দাঁড়িয়ে আছেন রাবণ, এবং প্রত্যক্ষ করছেন সমগ্র লংকা। তিনি নিজে যেন এক বিরাট মহাকাশের মহারাজা ঃ

দেখিলা রাজা নগর বাহিরে,
রিপুবৃন্দ, বালিবৃন্দ সিন্ধু তীরে যথা,
নক্ষত্রমণ্ডল কিংবা আকাশ—মণ্ডলে।

সেখানে চিত্রকল্পের সাহায্যে কবি রাবণের বিরাট মহিমা পাঠকের মনে চিরস্থায়ী করে দিয়েছেন। স্রষ্টা যেমন সৃষ্টির দিকে মমতাময় দৃষ্টিতে তাকান, তেমনিভাবে রাবণ অনন্তসমুদ্রের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করেছেন ঃ

রাবণ, ফিরায়ে আঁখি, দেখিলেন দূরে
সাগর মকরালয়। মেঘশ্রেণী যেন
অচল. ভাসিছে জলে শিলাকুল, বাঁধা

দূর বাঁধে। দুই পাশে তরংগ-নিচয়,
ফেনাময়, ফণাময় যথা ফনিবর,
উথলিছে নিরন্তর গভীর নির্ঘোষে। (প্রথম সর্গ)

তারপর রাবণ যখন সমুদ্রকে ভ্যসনা করছেন ঃ

প্রভঞ্জন বৈরী তুমি ; প্রভঞ্জন-সম
ভীম পরাক্রমে। কহ, এ নিগড় তবে
পর তুমি কোন পাপে ? (প্রথম সর্গ)

তখন রাবণকে সমুদ্রের চেয়েও শতগুণ বেশি পরাক্রান্ত মনে হয় ; শত্রুসৈন্য যেমন তাঁর কাছে ক্ষুদ্র বালি বিন্দু, নিগড়ে বাঁধা সমুদ্রও যেন তেমনি ক্ষুদ্র পল্বল মাত্র। আমাদের বুঝতে বাকি থাকে না কেন প্রথম সর্গের একেবারে প্রারম্ভে রাবণের সংগে সংগে কবি হেমকূটশৃংগের চিত্রটিকেও মঞ্চে নিয়ে এসেছিলেন। সেই একই চিত্রকল্প কবি সপ্তম সর্গেও একই উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেছেন ঃ

'রক্ষঃ কুলপতি ;—হেমকুট-হেমশৃংগ-সমোজ্জ্বল তেজে'।

উভয় সর্গেই শোকসন্তপ্ত পিতার সামনে রাজসভায় এসে দাঁড়িয়েছেন শোকাকুলা বীরজননী ; প্রথম সর্গে বীরবাহু জননী চিত্রাংগদা, সপ্তমসর্গে মেঘনাদ-জননী মন্দোদরী। প্রথম সর্গে শোকের পরিবেশ অনেক বেশি বিস্তৃত, এবং অন্যান্য বর্ণনাও। কিন্তু উভয় সর্গেই শোকের পরিস্থিতি অনুরূপ, এবং কবি প্রথম সর্গের চিত্রকল্পটিই যেন এখানে আরেকবার প্রয়োগ করেছেন। চিত্রাংগদার বর্ণনা এরূপ ঃ

বীরবাহু-শোকে
বিবশা রাজমহিষী, বিহংগিনী যথা,
যবে গ্রাসে কাল ফনী কুলায়ে পশিয়া
শাবকে।

আর মন্দোদরীর বেলায়ও সেই নীড়বিহংগীর চিত্রকল্প ঃ

হেনকালে সভাতলে উত্তরিলা রানী
মন্দোদরী, শিশুশূন্য নীড়হেরি যথা
আকুল কপোতী, হায়।

চিত্রাংগদার মতো মন্দোদরী অতিভাষিণী নন। রাবণের প্রতি কোনো অভিযোগও তিনি বয়ে আনেননি; প্রকৃত পক্ষে সভায় এসে একটি কথাও তিনি বলেননি; শোকে একেবারেই ভেঙে পড়েছেন। উভয়ক্ষেত্রেই রাবণের উক্তি ও ব্যবহারের মধ্যে যে পৌরুষ, ব্যক্তিত্ব ও গাম্ভীর্য প্রকাশ পেয়েছে তা তাঁর মানসিক উচ্চতারই দ্যোতক। প্রথম সর্গের মতো রাবণ এখানে কোনো দার্শনিক প্রগলভ্‌তার আশ্রয় নেননি, কারণ বীরবাহু নিহত হন সম্মুখ সমরে, আর মেঘনাদ নিহত হয়েছেন লক্ষ্মণরূপী গুপ্তঘাতকের হাতে। প্রথম সর্গে রাবণের উক্তিতে ক্রোধের চেয়ে শোক ও হতাশার সুরই একটু বেশি প্রবল মনে হয় :

এতদিনে (কহিলা ভূপতি)
বীরশূন্য লংকা মম। একাল সমরে,
আর পাঠাইব কারে? কে আর রাখিবে
রাক্ষসকুলের মান? যাইব আপনি;
সাজ হে বীরেন্দ্রবৃন্দ, লংকার ভূষণ।

সপ্তম সর্গে রাবণ বলেছেন :

কিন্তু না বিলাপি আমি। কি ফল বিলাপে?
আর কি পাইব তারে? অশ্রুবারিধারা,
হায়রে, দ্রবে কি কভু কৃতান্তের হিয়া
কঠিন? সমরে এবে পশি বিনাশিব
অধর্মী সৌমিত্রি মূঢ়ে, কপট-সমরী;

অবশ্য এর কোনটাই অনুবর্তীদের প্রতি রামের উক্তির মতো অতটা দুর্বল নয় : "দেবাশ্রিত সদা,/এ দাস; দেবতাকুল রক্ষিবে দাসেরে।"

রাবণকে কবি যে শৌর্য ও আত্মিক উচ্চতায় স্থাপন করেছেন সেই উচ্চতল থেকে রাবণ নিহত পুত্র মেঘনাদকেও উচ্চতায় উন্নীত দেখছেন। রানী মন্দোদরীর দৃষ্টিকেও তিনি চিত্রকল্পের মধ্যে আহ্বান করছেন পুত্রের এই সমুন্নতি লক্ষ করবার জন্য :

বনসুশোভন শাল ভূপতিত আজি;
চূর্ণ তুংগতম শৃংগ গিরিবরশিরে;
গগনরতন শশী চিররাহু গ্রাসে।

শাল, শৃংগ, শশী—বৃক্ষচূড়া থেকে গিরিচূড়া ; গিরিচূড়া থেকে আকাশ-শীর্ষ, এই ভাবেঃ ধাপে ধাপে মন্দোদরীকে আরো ঊর্ধে চোখ তুলতে সাহায্য করেছেন লংকেশ্বর। কবি এই ক্লাইম্যাক্স পদ্ধতি প্রথম সর্গেও প্রয়োগ করেছেন রাবণের বিষয়ে। সেখানে রাবণ প্রথমে সিংহাসনে আসীন, তারপর সভাসদ—সহ পদচারী, তারপর প্রাসাদ শিখরে দণ্ডায়মান। একই কারণে বীরবাহু ও মেঘনাদ উভয়কেই কবি একই ধরনের চিত্রকল্পে আবদ্ধ করেছেন।

প্রথম সর্গে, "ফুলদল দিয়া/কাটিলা কি বিধাতা শাল্মলী তরুবরে ?" সপ্তম সর্গে, "বনসুশোভন শাল ভূপাতিত আজি ;" প্রথম সর্গে, "অভ্রভেদী চূড়া যদি যায় গুঁড়া হয়ে বজ্রাঘাতে সপ্তম সর্গে, "চুর্ণ তুংগতম শৃংগ গিরিবর শিরে" ; প্রথম সর্গ "আঁধার জগৎ, মরি, ঘন আবরিলে দিননাথে," সপ্তম সর্গে, "গগনে রতন শশী চিররাহু গ্রাসে।" অতএব রাবণের ব্যক্তিত্ব ও মহত্ত্ব বুঝতে হলে প্রথম ও সপ্তম সর্গ—একত্র বিচার করতে হবে। বীরবাহু ও মেঘনাদ উভয়েই রাবণের আত্মজ, তাদের গরিমাও রাবণেরই গরিমা-সম্ভূত। প্রথম সর্গ থেকে নবম সর্গ পর্যন্ত বিস্তৃত রাবণের এই ব্যক্তিত্বময় প্রতিষ্ঠা। মেঘনাদবধ মহাকাব্যে দ্বিতীয় কোনো নায়ক দেখিনা যিনি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এমন প্রবলভাবে অস্তিত্ববান, যিনি শোক ও শৌর্য উভয়ক্ষেত্রেই অনন্য ; একমাত্র বীর যিনি এই মহাকাব্যে শেষ পর্যন্ত সিংহাসনে আরূঢ়, এবং অপরাজিত ; বীরবাহুবধ ও মেঘনাদবধ এই দুই ঘটনার অন্তবর্তী ও অনুবর্তী ভূমিতে যিনি একা সমানভাবে 'রাজরাজেন্দ্র'।

এপিক নায়ক সর্বদাই তাঁর গোষ্ঠি, কুল, জাতির মুখপাত্র এবং অনুগামীদের সংগে তাঁর দৃষ্টিভংগিও অভিন্ন। ট্রজিক নায়ক যেখানে অসামাজিক, গোষ্ঠি-বহির্ভূত ও একাকী, এপিক নায়ক সেখানে সামাজিক ও সহৃদয়। ক্রোধাক্ত রাবণ যখন তাঁর অনুগামী রাক্ষসদের প্রতি উদ্দীপক ভাষণ দিয়ে বল্লেনঃ

দেবদৈত্যনরত্রাস তোমরা সমরে ;
বিশ্বজয়ী ; স্মরি তারে, চল রণস্থলে ;
মেঘনাদহতরণে, এবারতা শুনি

কে চাহে বাঁচিতে আজি আজি এ কর্বুরকুলে,
কর্বুরকুলের গর্ব মেঘনাদ বলী।

তখন তাঁর অনুগামীদের মনেও অনুরূপ ক্রোধ ও ক্ষোভের সঞ্চার হল :

নীরবিলা মহেশ্বাস নিশ্বাসি বিষাদে।
ক্ষোভে রোষে রক্ষঃ সৈন্য নাদিলা নির্ঘোষে,
তিতিয়া মহীরে, মরি নয়ন—আসারে।
শুনি সে ভীষণ স্বন নাদিলা গম্ভীরে
রঘু সৈন্য। ত্রিদিবেন্দ্র নাদিল ত্রিদিবে।

রোষ ও দীর্ঘশ্বাস-সূচক শ বা ষ-ধ্বনির মধ্যেই নেতা ও নীত এ দুয়ের সমমর্মিতা সূচিত হল। কবি এইভাবে শব্দ চিত্রকল্পের (sound imagery) নিপুন প্রয়োগে অনুগত রাক্ষসবীরদের সংগে রাবণের একাত্মতা ঘোষণা করলেন। এবং তারপর রাক্ষস ও রক্ষসৈন্যের মধ্যে সমতা দেখাবার জন্য ঐ একই শ/ষ—ধ্বনি রঘুসৈন্য পর্যন্ত প্রসারিত করলেন ; কিন্তু ইন্দ্রের বেলায় তা পৃথক হল : 'ত্রিদিবেন্দ্র নাদিল ত্রিদিবে' ; এর মধ্যে শ বা ষ-ধ্বনির নামগন্ধও নেই।

এই প্রথম নর ও রাক্ষস-সৈন্যদের সংগে দেবসৈন্যও সরাসরি যুদ্ধে অবতীর্ণ হচ্ছে। শুধু কুটনৈতিক সহায়তার উপর যখন আর ভরসা করা যাচ্ছে না, তখন ইন্দ্র স্বয়ং লংকার যুদ্ধ ক্ষেত্রে সসৈন্যে অবতীর্ণ। ভয়ভীতা মহী একটু পরেই নারায়ণকে বলবেন :

লংকার পানে দেখ, প্রভু, চাহি।
রণে মত্ত রক্ষোরাজ ; রণে মত্ত বলী
রাঘবেন্দ্র ; রণেমত্ত ত্রিদিবেন্দ্র রথী।
মদকল করিব্রয় আয়াসে দাসীরে।

এবার আর রাম-রাবণের যুদ্ধ নয়, রামেন্দ্র (রাম + ইন্দ্র)-রাবণের যুদ্ধ। এই যুদ্ধের বাতাবরণ সৃষ্টির জন্য কবি প্রলয়ের চিত্রকল্প রচনা করেছেন। মার্কণ্ডেয় পুরাণের যুদ্ধবর্ণনা ও জয়দেবের দশাবতার স্তোত্রের প্রলয়-বর্ণনা কবি ব্যাপকভাবে কাজে লাগিয়েছেন :

মন্দ্রিলা জীমূতবৃন্দ আবরি অম্বরে :
ইরম্মদে বাঁধি বিশ্ব, গর্জিল অশনি ;
চামুণ্ডার হাসিরাশি সদৃশ্য হাসিল
সৌদামিনী যবে দেবী হাসি বিনাশিলা
দুর্মদ দানবদলে, মত্ত রণমদে।
ডুবিল তিমিরপুঞ্জে তিমির-বিনাশী
দিনমণি ; বায়ুদল বহিলা চৌদিকে
বৈশ্বানর শ্বাসরূপে ; জ্বলিল কাননে
দাবাগ্নি ; প্লাবন নাদি গ্রাসিল সহসা
পুরী, পল্লী, ভূকম্পনে পড়িল ভূতলে
অট্টালিকা, তরুরাজি ; জীবন ত্যাজিল
উচ্চ কাঁদি জীবকুল, প্রলয়ে যেমতি।

পুনঃপুনিত মহাপ্রলয় ও ভূকম্পের ইমেজারি এই সর্গে প্রতীকের মতো ব্যবহৃত হয়েছে, একথা আমরা আগেই বলেছি। দশাবতার স্তোত্র এবং চণ্ডী বা মার্কণ্ডেয় পুরাণের উপাদান কবি কিভাবে কাজে লাগিয়েছেন সেটা এখানে দেখা যেতে পারে। চণ্ডমুণ্ডবধ উপাখ্যানে আছে, চণ্ডকে বধ করবার পূর্ব মূহূর্তে চণ্ডিকার ললাট-নির্গতা কালী চামুণ্ডা রোষে অট্টহাস্য করে ওঠেন ঃ

ততো জহাসাতিরুষা ভীমং ভৈরবনাদিনী
কালী করালবক্ত্রান্ত দুর্দর্শদশনোজ্জ্বলা ॥

তারপর মুণ্ডকেও বধ করে দানবদের ছিন্নাশির হাতে বয়ে কালী চামুণ্ডা এলেন চণ্ডিকার কাছে, বল্লেন—দেবী, শুম্ভ-নিশুম্ভকে বধ করবার ভার আপনি নিজেই গ্রহণ করুন।

শিরশচণ্ডস্য কালী চ গৃহীত্বা মুণ্ডমেব চ।
প্রাহ প্রচণ্ডাট্টহাস মিশ্রমভ্যেত্য চণ্ডিকাম্ ॥
ময়া তবাত্রোপহৃতৌ চণ্ডমুণ্ডা মহাপশু।
যুদ্ধ যজ্ঞে স্বয়ং শুভং নিশুম্ভঞ্চ হনিষ্যসি ॥

—কালী চামুণ্ডা চণ্ড ও মুণ্ডের শির হাতে নিয়ে চণ্ডিকার কাছে এলেন এবং প্রচণ্ড

অট্টহাস্য সহকারে বল্লেন, এই যুদ্ধ যজ্ঞে আমি আপনাকে মহাপশু চণ্ড মুণ্ডের মস্তকদ্বয় উপহার দিলাম, এবার আপনি স্বয়ং শুম্ভ ও নিশুম্ভকে বধ করবেন।

কবি এখানে প্রলয়ের চিত্র অংকিত করে বর্ণনা শেষ করেছেন। কিন্তু পরক্ষণেই আবার প্রলয়ের খেইটি ধরিয়ে দিয়েছেন। বৈকুণ্ঠে বিষ্ণুর কাছে যখন বসুমতি (মহী) আর্ত আবেদন রাখছেন :

বারে বারে অধিনীরে, দয়াসিন্ধু তুমি,
হে রমেশ, তরাইলা বহুমূর্তি ধরি ;—
কুর্ম পৃষ্ঠে তিষ্ঠাইলা দাসীরে প্রলয়ে
কুর্মরূপে, বিরাজিনু দশন শিখরে
আমি, (শশাংকের দেহে কলংকের রেখা—
সদৃশী) বরহমূর্তি ধরিলা যে কালে,
দীনবন্ধু। নরসিংহবেশে বিনাশিয়া
হিরণ্যকশিপু দৈত্যে, জুড়ালে দাসীরে।
খর্বিলা বলির গর্ব খর্বাকার ছলে,
বামন। বাঁচিনু প্রভু তোমার প্রসাদে।

বসুমতী পুর্ব- পূর্ব প্রলয়ের স্মৃতি স্মরণ করে ব্যাকুল হয়ে পড়েছেন, চারিদিকে আবার প্রলয়ের ঘনঘটা, এবারও যাতে বিষ্ণু তাকে রক্ষা করেন সেই প্রার্থনাই তিনি জানাতে এসেছেন। জয়দেবের গীতগোবিন্দে দশাবতার স্তোত্র স্তবক নিম্নরূপ :

প্রলয় পয়োধিজলে ধৃতবানসি বেদং
বিহিত ব হি ত্র চরিত্রমখেদং
কেশব ধৃতমীনশরী র
জয় জগদীশ হরে ।।
ক্ষিতিরতি বিপুলতরে তব তিষ্ঠতি পৃষ্ঠে
ধরনি ধরণ কিণ চক্রগরিষ্ঠে।
কেশব ধৃত কচ্ছপরূপ
জয় জগদীশ হরে ॥

বসতি দশনশিখরে ধরনী তব লগ্না
শশিনি কলংককলেব নিমগ্না ।
কেশব ধৃত শূকর রূপ
জয় জগদীশ হরে ॥
তব করকমলবরে—নখমদ্ভুতশৃংগং
দলিত হিরণ্যকশিপুতনুভৃংগম্ ।
কেশবধৃত নরহরিরূপ
জয় জগদীশ হরে ॥
ছলয়সি বিক্রমেণ বলিমদ্ভুত বামন
পদনগনীর জনিত জন পাবন
কেশবধৃত বামনরূপ
জয় জগদীশ হরে ॥

মহী দশটি অবতারের মধ্যে প্রথমটির (মৎস্য বা মীন) উল্লেখ করেননি, কারণ তখনও জগৎ জলময় এবং মহী তখনও অস্তিত্ব বা অবয়বহীন। কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন এই পর্যন্ত এসেই মধুসূদন থেমে গেছেন। কারণ রামায়ণ কাহিনীর সমীপবর্তী, সমসাময়িক বা পরবর্তী অবতারগণের উল্লেখ করলে তাতে কালানুক্রম-ভঙ্গ ঘটতো। মহী যে প্রচীন সুদূর অতীতের কথা বলেছেন এ ভাবটি তাতে নষ্ট হত। অবশ্য "তরাইলা বহু মূর্তি ধরি" এই উল্লেখের মধ্যে অনুল্লিখিত ভাবী অবতারগণের ইঙ্গিতও রয়ে গেছে। যিনি বহুবার পৃথিবী ও মনুষ্য সমাজকে পরিত্রাণ করেছেন তিনি ভবিষ্যতেও বহুবার তাই করবেন, এই বিশ্বাস নিয়েই মহী এখানে উপস্থিত। কিন্তু মহীর মুখে জয়দেবের 'দশাবতার স্তোত্র' থেকে কয়েকটি পদ (উপরের উদ্ধৃতিতে রেখাংকিত) হুবহু বসিয়ে দিয়ে কবি পাঠককে পুরো দশবতার স্তোত্র এবং দশাবতারের ভূমিকা সম্বন্ধেই অবহিত করে দিচ্ছেন, বিশেষ করে দশাবতার স্তোত্রের সেই অনুল্লিখিত অংশ যেখানে, রামচন্দ্রকেই সপ্তম অবতার হিসেবে দেখানো হয়েছে :

বিতরসি দিক্ষু রণে—দিক্‌পতি কমনীয়ং
দশমুখমৌলিবলিং রমণীয়ম্ ।

কেশবধৃত রঘুপতিরূপ
জয় জগদীশ হরে ॥

এখানে মধুসূদনের সঙ্গে জয়দেবের একটি বিষয়ে আশ্চর্য মিল দেখা যাচ্ছে। রাম রাবণকে বধ করবেন একথা ঠিক। কিন্তু রাবণকে জয়দেব কোনো বীভৎস বিকটাকার রাক্ষস বলে বর্ণনা করেননি। বরং খুবই অপ্রত্যাশিতভাবে তিনি দশাননকে একটি নিবেদিত 'বলি' বা অর্ঘ্য হিসেবে বর্ণনা করেছেন এবং তার সঙ্গে 'রমণীয়' এই অবিশ্বাস্যপ্রায় বিশেষণটিও জুড়ে দিয়েছেন। আট শতাব্দী আগে আরেকজন বাঙালী কবি যাকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের আদি কবি বলা হয়—রামকে প্রথাসিদ্ধ ভাবে 'অবতার' বলে স্বীকার করেও যে মধুসূদনের মতোই রাবণের প্রতি এমন মমতা ও সূক্ষ্ম পক্ষপাত দেখাতে পেরেছিলেন; এটি কম বিস্ময়কর নয়। হয়তো সেইজন্য মধুসূদনও চিত্রকল্প রচনায় জয়দেবের প্রতি বিশেষ পক্ষপাত দেখিয়েছেন এবং মহীর মুখ দিয়ে দশাবতার স্তোত্রের প্রথমার্ধের বাংলা ভাষ্য পরিবেশন করেছেন।

লক্ষ্মন গুপ্ত ঘাতকের মতোই নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে হানা দিয়েছিলেন। নিরস্ত্র হওয়া সত্ত্বেও ইন্দ্রজিত কিন্তু ঘাতককে বাধা দেন এবং শেষ পর্যন্ত লক্ষ্মণের অসির আঘাতে নিহত হন। এক পক্ষের সশস্ত্র আক্রমণ এবং বিপরীত দিকে নিরস্ত্র আত্মরক্ষা এবং তজ্জনিত এই যে ধ্বস্তাধ্বস্তি, একে যুদ্ধ বলাই চলে না। কবি ষষ্ঠ সর্গে একে 'অন্যায় সমর' ছাড়া আর কিছুই বলেননি। কিন্তু সপ্তম সর্গে দেখা যায় দেবতারা আধুনিক যুদ্ধের 'প্রচার' কৌশলে পুনঃ পুনঃ প্রচার দ্বারা মিথ্যাকেই সত্য বলে চালিয়ে দিতে চেষ্টা করেছেন। স্বয়ং মহাদেব বলছেন, "হত রথীপতি/ইন্দ্রজিৎ কাল রণে।"; "কি করে রাবণ, সতি, শুনি হত রণে/পুত্রবর?" মহাদেব বীরভদ্রকে 'ব্রীফিং' করবার সময় বলছেন "গতজীব রণে/আজি ইন্দ্রজিৎ, বৎস"; "সৌমিত্রি নাশিলা রণে দুর্মদ রাক্ষস"। এটা যে "অন্যায় সময়"—এইসব উক্তিতে তা একবারও স্বীকৃত হয়নি। বীরভদ্রও প্রথমে যথারীতি রাবণকে বলছেন, "হে রক্ষঃশ্রেষ্ঠ, হত রণে আজি/ কর্বুর কুলের গর্ব মেঘনাদে রথী।" রাবণও মূর্ছাভঙ্গের পর ভগ্নদূতের

উক্তি হুবহু বিশ্বাস করে বলছেন, "কহ দূত। কে বধিল চিররণজয়ী/ইন্দ্রজিতে আজি রণে?" আমরা আগেই দেখিয়েছি বীরভদ্র মধুসূদনের একটি অরিজিন্যাল সৃষ্টি, অন্য এপিক দূতদের মত তিনি ব্যক্তিত্বহীন নন। এখানেও দেখছি দূত হওয়া সত্ত্বেও একমাত্র বীরভদ্রই দূতসুলভ চর্বিতচর্বণ করতে গিয়েও নিজের মন্তব্য জুড়তে ভোলেননি। যেন ষষ্ঠ সর্গে ইন্দ্রজিতের উক্তির প্রতিধ্বনি করেই তিনি রাবণের উত্তরে বলছেন, "যজ্ঞাগারে সৌমিত্রি কেশরী,/রাজেন্দ্র, অন্যায়যুদ্ধে বধিল কুমতি,/বীরেন্দ্রে।" প্রথমবার রাবণকে শুধু 'রণে' বলেছেন, যাতে আকস্মিক আঘাতে রাবণ প্রথমেই কাতর না হন। একটু সইয়ে তারপর বলেছেন "অন্যায় যুদ্ধে" মেঘনাদকে হত্যা করা হয়েছে। এই কথা বলে রাবণের ক্রোধ উদ্রিক্ত করতে তিনি সচেষ্ট। তাঁর অনুবর্তী সৈন্যদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেবার সময় রামচন্দ্রের, বোধ করি, এই মিথ্যার পুণরুক্তি করতে একটু বেধেছে; তাই তিনি শুধু বলেছেন, "নাশিল সৌমিত্রি/দেবদৈত্য নরত্রাস ভীম মেঘনাদে", "নাশিল সৌমিত্রি রণে" একথা বলেননি। কিন্তু মানুষ রামচন্দ্র যে-মিথ্যাকে ভেঙ্গে দিয়েছেন, দেবরাজ ইন্দ্র সেই মিথ্যাকেই উচ্চকণ্ঠে উচ্চারণ করেছেন যখন কমলা দেবসভায় এসে পৌঁছেছেন:

"নিঃশংক দাস তোমার প্রসাদে/গতজীব রণে আজি দুরন্ত রাবনি।" মূর্ছিতা মন্দোদরীকে অন্তঃপুরে পাঠিয়ে দেবার পর ক্রুদ্ধ রাবণ কিন্তু বলেছেন:

> হত সে বীরেশ আজি অন্যায় সমরে,
> বীরবৃন্দ। চোরবেশে পশি দেবালয়ে,
> সৌমিত্রি বধিল পুত্রে, নিরস্ত্র সে যবে
> নিভৃতে।

'অন্যায় সমরে' ইন্দ্রজিৎ নিধনের কথা রাবণ বীরভদ্রের কাছ থেকেই জেনেছেন। তার আগে পর্যন্ত রাবণ জানতেন "দেবদৈত্যজয়ী/লঙ্কার পংকজ রবি সাজিছে সমরে।" সে-সমর আর এই "অন্যায় সমরে" অবশ্য আকাশপাতাল তফাৎ। লক্ষণীয় যে মেঘনাদ বধ সম্বন্ধে রাবণের দৃষ্টিভঙ্গি এবং বীরভদ্রের দৃষ্টিভঙ্গি হুবহু এক। যে-সাজে মেঘনাদের সজ্জিত হবার কথা ছিল তার

সঙ্গে যে-তথাকথিত সমরে মেঘনাদকে বধ করা হল তার পার্থক্য স্মরণ করেই রাবণ বলেছেন ঃ

সমরে এবে পশি বিনাশিব
অধর্মী সৌমিত্রি মূঢ়ে, কপটসমরী ;

এরপর যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে রাবণ বলেছেন "অন্যায় সমরে/মারিল নন্দনে মোর লক্ষ্মণ" ;— কিন্তু বসুমতী বৈকুণ্ঠে গিয়ে বিষ্ণুর কাছে কেঁদে বলেছেন ঃ

দেবাকৃতি রথীপতি সৌমিত্রি কেশরী
বধিলা সংগ্রামে আজি ভীম মেঘনাদে ;

ইন্দ্রকে সম্বোধন করে সশ্লেষে তিনি বলেছেন ঃ

হত সে রাবণি,
তোমার কৌশলে, আজি কপট সংগ্রামে।
তেঁই বুঝি আসিয়াছ লংকাপুরে তুমি,

রামকে সামনে পেয়ে বলছেন ঃ

কোথা সে অনুজ তব কপটসমরী
পামর ? মারিব তারে ;

এবং সর্বশেষে লক্ষ্মণকে ভর্ৎসনা করছেন ঃ

পশিলি রাক্ষসালয়ে চোর বেশ ধরি
হরিলি রাক্ষসরত্ন—অমূল জগতে।

লক্ষ্মণকে যে 'দৈবাকৃতি' বলা হচ্ছে তা যথার্থ, শুধু আকৃতি নয় প্রকৃতিতেও লক্ষ্মণ ও দেবতারা সমধর্মী, নিরস্ত্রকে অন্যায় ও গুপ্তভাবে হত্যা করার প্রচেষ্টা উভয়ের কাছেই সংগ্রাম বলে অভিহিত ; ন্যায়-অন্যার বোধ বা ক্ষাত্র বিবেক এদের কারোরই নেই ; উভয়েই একই ষড়যন্ত্রে ষড়যন্ত্রী।

মেঘনাদবধকাব্যের সৈন্যবর্ণনায় কবি একাধিকবার এরিয়াল বা নভশ্চর দৃষ্টিভংগি গ্রহণ করেছেন। এখানে বিষ্ণু বৈকুণ্ঠের উচ্চতল থেকে 'ট্রাইফোকাল' বা ত্রিমুখী দৃষ্টি দিয়ে রাক্ষস, রাঘব ও দেব সৈন্যদলকে নিরীক্ষণ করছেন ;—

(১) দেখিলা রাক্ষসবল বাহিরেছে দলে
অসংখ্য, প্রতিঘ-অন্ধ, চতুঃস্কন্ধ রূপী ;
চলিছে প্রতাপ আগে জগৎ কাঁপায়ে ;

পশ্চাতে শব্দ চলে শ্রবণ বধিরি ;
চলিছে পরাগ পরে দৃষ্টিপথ রোধি
ঘন ঘনাকার রূপে। টলিছে সঘনে
স্বর্ণলংকা। (২) বহির্ভাগে দেখিলা শ্রীপতি
রঘুসৈন্য; উর্মিকুল সিন্ধু মুখে যথা
চির-অরি প্রভঞ্জন দেখা দিলে দূরে।
(৩) দেখিলা পুণ্ডরীকাক্ষ, দেবদল বেগে
ধাইছে লংকার পানে, পক্ষীরাজ যথা
গরুড় হেরিয়া দূরে সদা-ভক্ষ্য ফনী
হুংকারে।

এই তিনটি বর্ণনার মধ্যে কবি সব চেয়ে সাড়ম্বর ও রাজকীয় বর্ণনা দিয়েছেন রাক্ষসসৈন্যের। রামচন্দ্রের বাহিনীকে 'রাঘবসৈন্য' না বলে তিনি 'রঘুসৈন্য' বলেছেন এবং রঘুসৈন্য পদটি ব্যবহার করবার কথা মনে আসতেই সম্ভবত মধুসূদন রামের পূর্বপুরুষ রঘুর দিগ্বিজয়ের বিখ্যাত বর্ণনাটি মনে করেছেন। কালিদাস রঘুবংশের চতুর্থ সর্গে রঘুর দিগ্বিজয়ের যে অসামান্য স্বদেশচেতন বিবরণ দিয়েছেন মধুসূদন তা কিন্তু এখানে রঘুসৈন্যের অর্থাৎ রামচন্দ্রের সৈন্যবাহিনীর বর্ণনায় ব্যবহার না করে রাবণসৈন্যের বর্ণনাতে কাজে লাগিয়েছেন। রাবণসৈন্যকে রঘুর সৈন্যের সঙ্গে সমীকৃত করলে রাবণকেও রঘুর সংগে সমীকৃত করা হয়। মধুসূদন তাই করেছেন। রাবণের প্রতি মধুসূদনের মনোভাব এর থেকে সূক্ষ্ম ও শিল্পসম্মতভাবে আর কিভাবে প্রকাশ করা যেত? রঘুর বংশধর হয়েও রামচন্দ্র রঘুর সংগে তুলনার যোগ্য হলেন না, যোগ্য হলেন রাবণ। রঘুবংশে রঘুর দিগ্বিজয় যাত্রার বর্ণনায় আছে :

রজোভিঃ স্যন্দনোদ্ধূতৈঃ পৈজৈশ্চ ঘনসন্নিভৈঃ।
ভুবস্তলমিব ব্যোম কুর্বন্ ব্যোমেবভূতলম্॥
প্রতাপোগ্রে ততঃ শব্দঃ পরাগস্তদনন্তরম্।
যযৌ পশ্চাদ্রথাদীতি চতুঃস্কন্ধের সা চমূঃ॥ (৪।২৯-৩০)

মধুসূদন রাক্ষসসৈন্যের যে বর্ণনা দিয়েছেন তা এই শ্লোক দুটির অনুবাদ বল্লেই

পশ্চাতে শব্দ চলে শ্রবণ বধিরি ;
চলিছে পরাগ পরে দৃষ্টিপথ রোধি
ঘন ঘনাকার রূপে। টলিছে সঘনে
স্বর্ণলংকা। (২) বহির্ভাগে দেখিলা শ্রীপতি
রঘুসৈন্য; উর্মিকুল সিন্ধু মুখে যথা
চির-অরি প্রভঞ্জন দেখা দিলে দূরে।
(৩) দেখিলা পুণ্ডরীকাক্ষ, দেবদল বেগে
ধাইছে লংকার পানে, পক্ষীরাজ যথা
গরুড় হেরিয়া দূরে সদা-ভক্ষ্য ফনী
হুংকারে।

এই তিনটি বর্ণনার মধ্যে কবি সব চেয়ে সাড়ম্বর ও রাজকীয় বর্ণনা দিয়েছেন রাক্ষসসৈন্যের। রামচন্দ্রের বাহিনীকে 'রাঘবসৈন্য' না বলে তিনি 'রঘুসৈন্য' বলেছেন এবং রঘুসৈন্য পদটি ব্যবহার করবার কথা মনে আসতেই সম্ভবত মধুসূদন রামের পূর্বপুরুষ রঘুর দিগ্বিজয়ের বিখ্যাত বর্ণনাটি মনে করেছেন। কালিদাস রঘুবংশের চতুর্থ সর্গে রঘুর দিগ্বিজয়ের যে অসামান্য স্বদেশচেতন বিবরণ দিয়েছেন মধুসূদন তা কিন্তু এখানে রঘুসৈন্যের অর্থাৎ রামচন্দ্রের সৈন্যবাহিনীর বর্ণনায় ব্যবহার না করে রাবণসৈন্যের বর্ণনাতে কাজে লাগিয়েছেন। রাবণসৈন্যকে রঘুর সৈন্যের সঙ্গে সমীকৃত করলে রাবণকেও রঘুর সংগে সমীকৃত করা হয়। মধুসূদন তাই করেছেন। রাবণের প্রতি মধুসূদনের মনোভাব এর থেকে সূক্ষ্ম ও শিল্পসম্মতভাবে আর কিভাবে প্রকাশ করা যেত? রঘুর বংশধর হয়েও রামচন্দ্র রঘুর সংগে তুলনার যোগ্য হলেন না, যোগ্য হলেন রাবণ। রঘুবংশে রঘুর দিগ্বিজয় যাত্রার বর্ণনায় আছে :

রজোভিঃ স্যন্দনোদ্ধূতৈঃ পৌরজৈশ্চ ঘনসন্নিভৈঃ।
ভুবস্তলমিব ব্যোম কুর্বন্ ব্যোমেবভূতলম্॥
প্রতাপোগ্রে ততঃ শব্দঃ পরাগস্তদনন্তরম্।
যযৌ পশ্চাদ্রথাদীতি চতুঃস্কন্ধের সা চমূঃ॥ (৪।২৯-৩০)

মধুসূদন রাক্ষসসৈন্যের যে বর্ণনা দিয়েছেন তা এই শ্লোক দুটির অনুবাদ বল্লেই

সঙ্গে যে-তথাকথিত সমরে মেঘনাদকে বধ করা হল তার পার্থক্য স্মরণ করেই রাবণ বলেছেন ঃ

সমরে এবে পশি বিনাশিব
অধর্মী সৌমিত্রি মূঢ়ে, কপটসমরী ;

এরপর যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে রাবণ বলেছেন "অন্যায় সমরে/মারিল নন্দনে মোর লক্ষ্মণ" ;— কিন্তু বসুমতী বৈকুণ্ঠে গিয়ে বিষ্ণুর কাছে কেঁদে বলেছেন ঃ

দেবাকৃতি রথীপতি সৌমিত্রি কেশরী
বধিলা সংগ্রামে আজি ভীম মেঘনাদে ;

ইন্দ্রকে সম্বোধন করে সশ্লেষে তিনি বলেছেন ঃ

হত সে রাবণি,
তোমার কৌশলে, আজি কপট সংগ্রামে।
তেঁই বুঝি আসিয়াছ লংকাপুরে তুমি,

রামকে সামনে পেয়ে বলছেন ঃ

কোথা সে অনুজ তব কপটসমরী
পামর ? মারিব তারে ;

এবং সর্বশেষে লক্ষ্মণকে ভর্ৎসনা করছেন ঃ

পশিলি রাক্ষসালয়ে চোর বেশ ধরি
হরিলি রাক্ষসরত্ন—অমূল জগতে।

লক্ষ্মণকে যে 'দৈবাকৃতি' বলা হচ্ছে তা যথার্থ, শুধু আকৃতি নয় প্রকৃতিতেও লক্ষ্মণ ও দেবতারা সমধর্মী, নিরস্ত্রকে অন্যায় ও গুপ্তভাবে হত্যা করার প্রচেষ্টা উভয়ের কাছেই সংগ্রাম বলে অভিহিত ; ন্যায়-অন্যার বোধ বা ক্ষাত্র বিবেক এদের কারোরই নেই ; উভয়েই একই ষড়যন্ত্রে ষড়যন্ত্রী।

মেঘনাদবধকাব্যের সৈন্যবর্ণনায় কবি একাধিকবার এরিয়াল বা নভশ্চর দৃষ্টিভংগি গ্রহণ করেছেন। এখানে বিষ্ণু বৈকুণ্ঠের উচ্চতল থেকে 'ট্রাইফোকাল' বা ত্রিমুখী দৃষ্টি দিয়ে রাক্ষস, রাঘব ও দেব সৈন্যদলকে নিরীক্ষণ করছেন ;—

(১) দেখিলা রাক্ষসবল বাহিরেছে দলে
অসংখ্য, প্রতিঘ-অন্ধ, চতুঃস্কন্ধ রূপী ;
চলিছে প্রতাপ আগে জগৎ কাঁপায়ে ;

হয়। বাঙালী কবি বিশেষ করে রঘুর দিগ্বিজয় বর্ণনায় আকৃষ্ট হয়েছেন, কারণ কালিদাস এখানেই মাইকেলের প্রিয় স্বদেশ গংগাহৃদিবংগভূমির উল্লেখ করেছেন :

বংগানুৎখায় তরসা নেতা নৌ- সাধনোদ্যতান্।
নিচখন জয়স্তম্ভান্ গংগা স্রোতোঽন্তরেষু সঃ ।। (৪।৩৬)

—'বংগদেশের রাজন্যবর্গ রণতরীসহযোগে বাধা দিলে তিনি সবলে তাদের পরাজিত করে গংগাপ্রবাহমধ্যবর্তী দ্বীপপুঞ্জে বিজয়স্তম্ভ প্রোথিত করলেন।' রঘু যদি শক্তিমান আদর্শ রাজা হন তবে মাইকেলের চোখে রাবণও পরাক্রান্ত আদর্শ রাজা। আর সেইজন্যই তিনি বিনা দ্বিধায় দিগ্বিজয়ী রঘুর সৈন্যবাহিনীর সংগে রাবণের সৈন্যবাহিনীর তুলনা করেছেন।

এরপর রামের সৈন্য বর্ণনা করতে গিয়ে কবি ঝড়ের সংগে রাবণ-সৈন্যের যে তুলনা করেছেন তা দিগ্বিজয় বর্ণনার সংগে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কিন্তু তারপর দেবসৈন্যের বর্ণনা প্রসংগে যখন দেবসৈন্যকে গুরুড় ও রাক্ষসবাহিনীকে সর্পের সংগে তুলনা করেছেন তখন আমাদের একটু খটকা লাগে, অবশ্য এই চিত্রকল্পে দেবসৈন্যের হিংস্র মনোভাবটিই শুধু ফুটিয়ে তোলা হয়েছে, কবির মনোভাব এতে প্রতিফলিত করা হয়নি। দেবসৈন্য গুরুড়ের সংগে তুলিত হবার পরমূহূর্তেই দেখি বসুমতি মহাদেবকেই কালসর্পের সংগে তুলনা করছেন :

হায়, প্রভু, দুরন্তসংহারী
ত্রিশূলী ; সতত রত নিধন সাধনেঃ
নিরন্তর তমোগুনে পূর্ব ত্রিপুরারি।
কাল-সর্প-সাধ, সৌরি, সদাদাইতে
উগরি বিষাগ্নিজীবে।

এই হিংস্র স্বভাব শুধু মহাদেবের নয়, সব দেবতাদেরই, পাঠক একবার বিষ্ণুর চোখ দিয়ে রাক্ষস, রাঘব ও দেবসৈন্যদের প্রত্যক্ষ করেছেন। কবি এবার নিজের চোখ দিয়ে পাঠককে সেই একই সৈন্যত্রয়ীকে প্রত্যক্ষ করাচ্ছেন। এখানেও কবির পক্ষপাত রাক্ষসবাহিনীর প্রতি। রাক্ষসসৈন্যের কথাই তিনি সর্বাগ্রে উল্লেখ করেছেন এবং সর্বশেষে দেবসৈন্যের :

যথা গৃহমাঝে বহ্নিজ্বলিলে উত্তেজে,

গবাক্ষ-দুয়ার পথে বাহিরায় বেগে
শিখাপুঞ্জ, বাহিরিলা চারি দ্বার দিয়া
(১) রাক্ষস, নিনাদি রোষে; গর্জিল চৌদিকে
(২) রঘুসৈন্য; (৩) দেববৃন্দ পশিল সমরে।

এরপর কবি দেবসৈন্যদের সামান্য তালিকাও যুক্ত করেছেন। কিন্তু রাক্ষস ও রাঘবসৈন্যের গর্জিত প্রবেশের পর দেবসৈন্যের প্রবেশ যেন একেবারেই নিঃশব্দ, শুধু 'পাশিল সমরে।' যেমন নিঃশব্দে লক্ষণ নিকুম্ভিলায় প্রবেশ করেছিলেন যেন অনেকটা সেইরকম। সাজ-পোষাকে তারা বিচিত্র এবং চিত্রিত, কিন্তু বোঝা যায় রণক্ষেত্রে প্রবেশ করার পরও অনেকক্ষণ পর্যন্ত তাদের কণ্ঠে কোনো গর্জন ফোটে নি; 'স্বর্গীয় বাজনা' এবং 'অমর নিনাদ' এসেছে সেনাপতি ও রথীদের অনেক পরে। রাঘবসৈন্য প্রসংগে রঘুবংশ থেকে সংগৃহীত পূর্বের বর্ণনাটি আরেকবার স্মরণ করলেই পার্থক্য সহজে ধরা পড়বে। রাক্ষসদের বেলায় প্রথমে ছিল বীরত্বের খ্যাতি ও কর্ণভেদী শব্দ, তারপর বাহিনী—

চলিছে (১) প্রতাপ অগ্রে জগৎ কাঁপায়ে;
পশ্চাতে (২) শব্দ চলে শ্রবণ বধিরি;
চলিছে (৩) পরাগ পরে দৃষ্টিপথ রোধি……

কিন্তু এখানে দেববাহিনীই অগ্রে, তাদের নিনাদ সবচেয়ে শেষে।

এই যুদ্ধে রামের ভূমিকা কতোটা পরনির্ভর তা ইন্দ্রের প্রতি তাঁর উক্তিতেই প্রকাশিত। তিনি যে স্বাধীন দেশের স্বাধীন রাজা নন, বিদেশী প্রভুর পদাশ্রিত দাস মাত্র 'দেবকুল দাস দাস;' রামচন্দ্রের মুখে যুদ্ধারম্ভের পূর্বমুহূর্তে 'দাস' 'পদাশ্রয়' ও 'চরণ পরশ' কথাগুলি চরম ক্লীবতারই পরিচয় দেয়। ইন্দ্রের উত্তরের মধ্যে যথেষ্ট পিঠ চাপড়ানি আছে; কিন্তু রামচন্দ্র যে দেবতাদের হাতে পুতুলমাত্র সে কথা গোপন থাকেনি। ইন্দ্রের উক্তির মধ্যে গোজামিল যথেষ্টই রয়েছে। একবার তিনি বলছেন রাম নিজের 'বাহুবলেই' রাবণকে বধ করবেন (অবশ্য যে রথে চড়ে তিনি যুদ্ধ করবেন সেটি 'দেবরথ' নিজের রথ নয়); পরক্ষণেই বলছেন, রাবণ নিজকর্মদোষেই ধ্বংস হবে। সর্বশেষে রামচন্দ্রকে বীর বলে সম্বোধন করেও রামের পক্ষে অপমানকর সত্যটি ব্যক্ত করে বলেছেন, দেবসৈন্যরাই

লংকা লণ্ড ভণ্ড করবে, রাবণকে দেণ্ড দেবে এবং সীতাকে উদ্ধার করে রামচন্দ্রের হাতে অর্পণ করবে :

উঠি দেবরথে, রথি, নাশ বাহুবলে
রাক্ষস অধর্মাচারী। নিজ কর্মদোষে
মজে রক্ষঃ কুলনিধি ; কে রক্ষিবে তারে ?
লভিনু অমৃত যথা মথি জলদলে,
লণ্ডভণ্ডি লংকা আজি, দণ্ডি নিশাচরে,
সাধ্বী মৈথিলিরে, শূর, অর্পিবে তোমারে
দেবকুল !

এর মধ্যে রামচন্দ্রের ভূমিকা থাকছে কোথায় বা আদৌ আছে কিনা তাই সন্দেহ। রাবণ যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবেশ করেই সারথির দৃষ্টি এই বিষয়ে আকর্ষণ করে বলেছেন :

নাহি যুঝে নর আজি, হে সূত, একাকী
দেখ চেয়ে। ধূমপুঞ্জে অগ্নিরাশি যথা,
শোভে অসুরারি দল রঘুসৈন্য মাঝে।

রাবণ যখন আকাশযানে আরোহণ করে রণক্ষেত্রে প্রবেশ করেছেন তখন একটি উপযুক্ত 'অনোম্যাটোপোয়েটিক' শব্দ চিত্রকল্প রচনা করে কবি তার বর্ণনা দিয়েছেন :

ঘর্ঘরিল রথচক্র নির্ঘোষে, উগরি
বিস্ফুলিংগ, তুরংগম হ্রেষিল উল্লাসে।

এবং তারপর শব্দধ্বনির মধ্যেই উদিত হয়েছেন রাবণ স্বয়ং।

সপ্তম সর্গের শুরুতে একবার সূর্যোদয় ঘটেছিল : 'উদিলা আদিত্য এবে উদয়—অচলে' ; কিন্তু আমরা দেখেছি সেই নৈসর্গিক সূর্যোদয় ছিল কুণ্ঠিত দ্বিধাজড়িত, তার প্রসন্নতার মধ্যে ছিল দারুণ এক আয়রনি। এই সর্গে প্রকৃত সূর্যোদয় ঘটেছে অনেক পরে, যখন রাবণ যুদ্ধক্ষেত্রে রথ নিয়ে প্রবেশ করছেন ঠিক তখন। যদিও এই সূর্যোদয় নিসর্গে ঘটেনি, ঘটেছে চিত্রকল্পের মধ্যে, তবু তার তেজ আমাদের নয়ন ধাঁধিয়ে দিয়েছে :

রতনসম্ভবা বিভা, নয়ন ধাঁধিয়া,
ধায় অগ্রে, ঊষা যথা. একচক্ররথে
উদনে আদিত্য যবে উদয়-অচলে।

রাবণের তেজস্বিতার দীপ্তিতে উজ্জ্বল এই সূর্যোদয়। এখান থেকে শুরু করে এই সর্গের শেষ পর্যন্ত রাবণের এই উজ্জ্বল্য অম্লান।

রাবণের ক্রোধ থেকেই এ সর্গের রৌদ্ররসের সৃষ্টি। এক পবিত্র ক্রোধ রাবণের চরিত্রে দিয়েছে দৃঢ়তা ও উত্তুংগতা। রাবণের তুলনা খুঁজতে কবি আরেক মহাকাব্যের দ্বারস্থ হয়েছেন, সেটি মহাভারত :

আইলা রোষে দৈত্যকুল অরি
হেরি পার্থ কর্ণ যথা কুরুক্ষেত্ররণে।

মহাভারতের কর্ণপর্বে দেখি অর্জুন কর্ণপুত্র বৃষসেনকে বধ করার পর কর্ণ যখন পুত্র শোকে সন্তপ্ত তখনই তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে অর্জুনকে দেখতে গোলন এবং রোষতাম্রনেত্রে অর্জুনের প্রতি ধাবিত হলেন। বৃষসেনকে বধ করার পিছনে অর্জুনের তবু কিছুটা আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ ছিল, এবং বৃষসেনকে বধ করার আগে অর্জুন কৌরব বীরদের দিকে তাকিয়ে উচ্চকণ্ঠে সে-কথা ঘোষণাও করেছিলেন, বলেছিলেন,, সবাই বলে যে আমার পুত্র অভিমন্যু যখন রথের মধ্যে একা ছিল তখন তোমরা সবাই মিলে তাকে বধ করেছিলে। কিন্তু আমি তোমাদের সবার সমনেই বৃষসেনকে বধ করবো, ক্ষমতা থাকে তোমারা তাকে রক্ষা করো। কিন্তু মেঘনাদকে লক্ষণ সপ্তরথীদের চেয়েও ঘৃণ্যভাবে, চোরের মত এসে, নিকুম্ভিলায় বধ করেছেন। রাবণ স্বভাবতই ক্রুদ্ধ। কর্ণের সঙ্গে তুলনার কারণ, কর্ণ যেমন পুত্রহত্যার প্রতিশোধ-কামনায় উদ্দীপ্ত ও ক্রুদ্ধ হয়ে অর্জুনকে আক্রমণ করেছিলেন রাবণও তেমনি পুত্রহত্যার প্রতিশোধ-কামনায় উদ্দীপ্ত ও ক্রুদ্ধ হয়ে রামকে আক্রমণ করতে প্রবৃত্ত হয়েছেন। কর্ণ যেমন যুদ্ধে অর্জ্জুনের হাতেই শেষ পর্যন্ত নিহত হন, রাবণও তেমনি রামের হাতেই নিহত হতে চলেছেন এই ব্যঞ্জনাটুকু কবি এই চিত্রকল্পে অব্যর্থভাবে ধরতে চেয়েছেন; সঙ্গে সঙ্গে কর্ণ ও রাবণের ট্রাজিক মহত্ত্বে যে যথার্থ (যথা)

সাদৃশ্য তাও তুলে ধরেছেন। মহাকাব্যেই মহাকাব্যর যথার্থ তুলনা, এবং মহাকাব্যের উত্তুঙ্গ চরিত্রগুলির উপযুক্ত তুলনাও অন্যান্য মহাকাব্যের অনুরূপ চরিত্রের সঙ্গেই সম্ভব। মাইকেল মধুসূদন যদি কখনো মহাভারত অবলম্বন করে নবীন মহাকাব্য রচনা করতে প্রয়াসী হতেন তবে যে কর্ণকেই নায়ক হিসেবে বেছে নিতেন তাও অনুমান করতে পারি।

মধুসূদন রামায়ণ ও মহাভারত উভয় মহাকাব্যের যুদ্ধক্ষেত্রই ব্যবহার করেছেন এবং সপ্তম সর্গে রামলক্ষণ ও রাবণ যেন লঙ্কা ও কুরুক্ষেত্র উভয় রণাঙ্গনে দাঁড়িয়েই শর ও বাক্যবান নিক্ষেপ করেছেন। উপরের চিত্রকল্পে কর্ণের উপস্থিতিও তারই আভাস। মেঘনাদবধকাব্যে যোদ্ধা রামকে মধুসূদন যেন কতকটা মহাভারতে কর্ণপর্বের যোদ্ধা যুধিষ্ঠিরের ছাঁচে তৈরি করেছেন। কর্ণপর্বে যুধিষ্ঠিরকে কর্ণ উপহাস করে বলেছিলেন, 'হে পাণ্ডুনন্দন! তুমি ক্ষত্রিয়কুলে জন্ম গ্রহণ করে এবং ক্ষাত্রধর্ম অবলম্বন করেও প্রাণভয়ে রণক্ষেত্র থেকে পলায়ন করছো। হয়ত ক্ষত্রিয়ধর্ম তোমার সম্যক জানা নেই। কারণ নিয়মিত বেদপাঠ ও যাগযজ্ঞ করাই তোমার অভ্যাস। যুদ্ধ করা ঠিক তোমার কাজ নয়। আমি বলি, যুদ্ধের বাসনা ছাড়, যোদ্ধাদের কাছেও যেও না বা তাদের গালিও দিওনা।' এই কথা বলে মহাবীর কর্ণ যুধিষ্ঠিরকে ছেড়ে অন্যত্র যুদ্ধে মনোনিবেশ করেন এবং যুধিষ্ঠিরও লজ্জায় পালিয়ে যান। পরে আবার যখন যুধিষ্ঠির নকুল ও সহদেব সহ কর্ণকে আক্রমণ করেন তখন সারথি শল্য কর্ণকে বলেছিলেন, 'কর্ণ, আজ তোমাকে অর্জুনের সংঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে। আজ কেন বৃথা ক্রোধবশে যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে শক্তিব্যয় করেছো?' মেঘনাবধকাব্যের রাবণের মেজাজ কর্ণের মতোই, এখন পুত্রহন্তা লক্ষ্মণকে তিনি খুঁজছেন, যেমন পুত্রহন্তা অর্জুণকে কর্ণ খুঁজছিলেন। যুধিষ্ঠিরকে কর্ণ যেমন বলেছিলেন তেমনি উপহাসের সুরেই রাবণ রামকে এখানে লঘু করেছেন এবং তাঁকে পাত্তা না দিয়েই অন্যত্র যুদ্ধ করতে চলে গেছেন :

কহিলা রাক্ষসপতি ; 'না চাহি তোমারে
আজি, হে বৈদেহিনাথ। এ ভবমণ্ডলে

আর একদিন তুমি জীব নিরাপদে।
কোথা সে অনুজ তব কপটসমরী
পামর? মারিব তারে; যাও ফিরি তুমি
শিবিরে, রাঘবশ্রেষ্ঠ।'

কৃত্তিবাসে কিন্তু রামকে তুচ্ছ করার কোনো ইঙ্গিতই নেই, সেখানে দেখি লক্ষ্মণ শক্তিশেলে আহত হবার আগে, রাবণ রামের সঙ্গে 'মহারণে' প্রবৃত্ত হয়েছিলেন এবং রাম সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে গেলে লক্ষ্মণ রাবণের সামনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন ঃ

দৈবের লিখন কভু না যায় খণ্ডন।
শ্রীরাম রাবণে দোঁহে বাজে মহারণ।
শতবাণ যোড়ে রাজা ধনুকের গুণে।
কাটিলা বিংশতি বাণে রাজীব লোচনে।।
বাছিয়া রাবণ বরিষয়ে চোখা শর।
বিন্ধিয়া কোমল অঙ্গ করিল জর্জর।।
বাণাঘাতে রঘুনাথ হৈলা অচেতন।
রামে পাছু করি আগে দাঁড়াল লক্ষ্মণ।।

শুধু তাই নয়, কৃত্তিবাসী রামায়ণে শক্তিশেল নিক্ষেপের পর রামচন্দ্র পুনরায় রাবণের আক্রমণের সম্মুখীন হন এবং আক্রমণে অতিষ্ঠ হয়ে পলায়ন করেন। এরপর লক্ষণ-অভিমুখী রাবণের সঙ্গে লক্ষ্য-মুখী বাজ পাখির তুলনা যদিও সমীচীন তবু এই চিত্রকল্পে লক্ষ্মণকে কপোতের সঙ্গে তুলিত করে কবি লক্ষ্মণের প্রতি যতটা অবিচার না করেছেন তার চেয়েও অনেক বেশি অবিচার করেছেন কপোতের প্রতি, এবং এই মহাকাব্যে ব্যবহৃত কপোত সম্পর্কিত যাবতীয় চিত্র-কল্পের প্রতি। যে-লক্ষ্মণকে রাবণ এইমাত্র 'কপটসমরী' বলেছেন, যিনি গুপ্তঘাতক হিসেবে চিহ্নিত, তাঁকে 'কপোত' বলার প্রকৃতপক্ষে কোনোই হেতু নেই। 'কপোত' বললেই যে শুভ্রতা, শান্তি, নির্দোষতা ও কোমলতার কথা মনে হয়, এখানে লক্ষ্মণ সম্পর্কে তার কোনটিই প্রযোজ্য নয়। কবি যদিও চান পাঠকের দুই চোখই বাজপাখির প্রতি নিবিষ্ট থাকুক, দূরবর্তী কপোতটির প্রতি আপাতত মনোযোগী হবার দরকার নেই, তবু কপোতের উল্লেখে তার কাংক্ষিত ফল

অনেকটাই ক্ষুণ্ণ হয়েছে কারণ এর আগে মহাকবি এই মহাকাব্যে কপোতের চিত্রটি একাধিকবার এমন মমতাময় স্মৃতির মধ্যে অংকিত করেছেন যে তার এফেক্ট এইভাবে হঠাৎ আচমকা ভেঙ্গে দেওয়া সম্ভব নয়। অজ্ঞাতসারে কবি নিজের কাছে নিজেই পরাজিত হয়ে যাচ্ছেন। কপোতের সঙ্গে তুলিত হওয়াতে লক্ষ্মণের প্রতি কিছুটা মমত্ব আপনা থেকেই তৈরি হয়ে যাচ্ছে ঃ

যথা হেরি দূরে
কপোত, বিস্তারি পাখা, ধায় বাজপতি
অম্বরে ; চলিলা রক্ষঃ হেরি রণভূমে
পুত্রহা সৌমিত্রি শূরে ;

'কপোত' বলার পর 'পুত্রহা সৌমিত্রির' প্রতি যথেষ্ট রোষ সঞ্চারিত করা সত্যিই কঠিন। কারণ দুর্বল, কোমল, নিরপরাধের প্রতি মানুষের সহানুভূতি চিরন্তন। তৃতীয় সর্গে বিরহিণী প্রমীলাকে আমরা দেখেছি "শূন্যনীড়ে কপোতী যেমতি বিবশা" চতুর্থ সর্গে সীতা সমরমাকে বনবাসের স্মৃতি রোমন্থন করে বলেছেন "ছিনু মোরা সুলোচনে, গোদাবরী-তীরে/কপোত-কপোতী যথা উচ্চ বৃক্ষ চূড়ে/বাঁধি নীড়, থাকে সুখে।" যদি কপোত পদটি ব্যবহার না করে মধুসূদন 'শিকার' বা কপোত ছাড়া অন্য যে কোন প্রতিশব্দ ব্যবহার করতেন তা হলে তা এতটা অস্বস্তিকর হত না। এর আগে রাবণ তাঁর পুষ্পকরথে চড়ে যুদ্ধক্ষেত্রে সবে প্রবেশ করেছেন তখন তিনি শত্রু সৈন্য যেভাবে ছিন্নভিন্ন করেন এবং শত্রু-ব্যূহ যেভাবে ভেদ কবেন তার বর্ণনায় কবি কিন্তু এই ভুল করেননি। তখনকার চিত্রকল্প এরূপ ঃ

পলাইল রঘুসৈন্য, পালায় যেমনি
মদকলকরিরাজে হেরি, ঊর্ধ্বশ্বাসে
বনবাসী —

অথবা, আরেকটি চিত্রকল্পের কথাই ধরা যাক; রাবনের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত এই চিত্রকল্পে কোনো অসংগতি নেই ঃ

টংকারি ধনু, তীক্ষ্ণতর শরে
মুহূর্তে ভেদিলা ব্যূহ বীরেন্দ্র-কেশরী,

[১] সহজে প্লাবন যথা ভাঙ্গে ভীমাঘাতে
বালিবন্ধ ! কিংবা যথা ব্যাঘ্র নিশাকালে
গোষ্ঠবৃতি ।

তাছাড়া এই চিত্রকল্পটি মধুসূদন একবার ব্যবহার করেই বিস্মৃত হননি ; প্রকৃত-পক্ষে মহাকাব্যে কোনো সুষ্ঠু চিত্রকল্পই একবার মাত্র ব্যবহৃত হয়ে বিস্মৃত হবার জিনিষ নয়। দেবসৈন্য, নরসৈন্য একত্র মিলিত হয়ে যুদ্ধ করেছে। এর উল্লেখ করে রাবণ যুদ্ধ ক্ষেত্রে প্রবেশ করতে করতে সারথিকে সম্বোধন করে বলেছিলেন ঃ

নাহি যুদ্ধে নর আজি, হে সূত, একাকী,
[২] দেখ চেয়ে ! ধূমপূঞ্জে অগ্নিরাশি যথা,
শোভে অসুরারিদল রঘুসৈন্য মাঝে ।

এই চিত্রকল্প এবং পুর্বোল্লিখিত 'সহজে প্লাবন যথা ভাঙ্গে ভীমাঘাতে! বালিবন্ধ' এই দুটি চিত্রই কবি আবার ব্যবহার করেছেন রাবণের আক্রমণে ছত্রভঙ্গ রাঘবসৈন্যের বর্ণনায় ঃ

পালাইলা সত্রাসে চৌদিকে
[১] রঘুসৈন্য, (জল যথা জাঙ্গাল ভাঙিলে
কোলাহলে); দেবদল, তেজোহীন এবে,
[২] পালাইলা নরসহ, ধূমসহ যথা
যায় উড়ি অগ্নিকণা বহিলে প্রবলে
প্লাবন ।

একই চিত্র একাধিকবার চোখের সামনে এনে কবি পাঠকের মনে এইসব ইমেজের একটি চমৎকার স্থায়ী আমেজ তৈরি করে দেন ।

এর পর রাবণ লক্ষ্মণকে একেবারে সামনে দেখতে পেলেন । ষষ্ঠ সর্গে বিভীষণকে লক্ষ্মণের পার্শ্বচর হিসেবে দেখতে পেয়ে মেঘনাদ প্রথম বুঝতে পেরেছিলেন কীভাবে গুপ্তঘাতক লক্ষ্মণ চোরের মতন নিকুম্ভিলায় প্রবেশ করেছে । সেই মুহূর্তে মেঘনাদের যে ক্ষোভ ও বিষাদ তারই সমুচিত জবাব দিতে এবং মেঘনাদ -হত্যার প্রতিহিংসা নিতেই রাবণ আজ যুদ্ধক্ষেত্রে এসেছেন। মধুসূদন

অনেকটাই ক্ষুণ্ণ হয়েছে কারণ এর আগে মহাকবি এই মহাকাব্যে কপোতের চিত্রটি একাধিকবার এমন মমতাময় স্মৃতির মধ্যে অংকিত করেছেন যে তার এফেক্ট এইভাবে হঠাৎ আচমকা ভেঙ্গে দেওয়া সম্ভব নয়। অজ্ঞাতসারে কবি নিজের কাছে নিজেই পরাজিত হয়ে যাচ্ছেন। কপোতের সঙ্গে তুলিত হওয়াতে লক্ষ্মণের প্রতি কিছুটা মমত্ব আপনা থেকেই তৈরি হয়ে যাচ্ছে :

যথা হেরি দূরে
কপোত, বিস্তারি পাখা, ধায় বাজপতি
অম্বরে ; চলিলা রক্ষঃ হেরি রণভূমে
পুত্রহা সৌমিত্রি শূরে ;

'কপোত' বলার পর 'পুত্রহা সৌমিত্রির' প্রতি যথেষ্ট রোষ সঞ্চারিত করা সত্যিই কঠিন। কারণ দুর্বল, কোমল, নিরপরাধের প্রতি মানুষের সহানুভূতি চিরন্তন। তৃতীয় সর্গে বিরহিণী প্রমীলাকে আমরা দেখেছি "শূন্যনীড়ে কপোতী যেমতি বিবশা" চতুর্থ সর্গে সীতা সমরমাকে বনবাসের স্মৃতি রোমন্থন করে বলেছেন "ছিনু মোরা সুলোচনে, গোদাবরী-তীরে/কপোত-কপোতী যথা উচ্চ বৃক্ষ চূড়ে/বাঁধি নীড়, থাকে সুখে।" যদি কপোত পদটি ব্যবহার না করে মধুসূদন 'শিকার' বা কপোত ছাড়া অন্য যে কোন প্রতিশব্দ ব্যবহার করতেন তা হলে তা এতটা অস্বস্তিকর হত না। এর আগে রাবণ তাঁর পুষ্পকরথে চড়ে যুদ্ধক্ষেত্রে সবে প্রবেশ করেছেন তখন তিনি শত্রু সৈন্য যেভাবে ছিন্নভিন্ন করেন এবং শত্রু-ব্যূহ যেভাবে ভেদ কবেন তার বর্ণনায় কবি কিন্তু এই ভুল করেননি। তখনকার চিত্রকল্প এরূপ :

পলাইল রঘুসৈন্য, পালায় যেমনি
মদকলকরিরাজে হেরি, ঊর্ধ্বশ্বাসে
বনবাসী —

অথবা, আরেকটি চিত্রকল্পের কথাই ধরা যাক; রাবনের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত এই চিত্রকল্পে কোনো অসংগতি নেই :

টংকারি ধনু, তীক্ষ্ণতর শরে
মুহূর্তে ভেদিলা ব্যূহ বীরেন্দ্র-কেশরী,

তাই রাবণের উক্তির মধ্যে ষষ্ঠসর্গের মেঘনাদের উক্তির কিছুটা প্রতিধ্বনি নিয়ে এসেছেন। ষষ্ঠ সর্গে আক্রান্ত মেঘনাদ বলেছিলেন :

"এতক্ষণে"—অরিন্দম কহিলা বিষাদে
"জানিনু কেমনে আসি লক্ষ্মণ পশিল
রক্ষ পুরে।....."

এখন আক্রমক রাবণ লক্ষণকে বলছেন :

"এতক্ষণে, রে লক্ষ্মণ"—কহিলা সরোষে
রাবণ, "এ রণক্ষেত্রে পাইনু কি তোরে
নরাধম ?"

রাবণ রক্ষঃপুরে অনুষ্ঠিত তস্করবৃত্তি ও গুপ্তহত্যার প্রত্যুত্তর দেবেন রণক্ষেত্রে, এবং মেঘনাদের অন্তিম বিষাদের প্রত্যুত্তরেই তিনি এখন সরোষ। রাবণ লক্ষণকে সম্বোধন করে বিদ্রুপাত্মক সুরে বলছেন :

কে তোরে
রক্ষিবে পামর, আজি ? এ আসন্ন কালে
সুমিত্রা জননী তোর, কলত্র উর্মিলা
ভাব্ দোঁহে। মাংস তোর মাংসাহারী জীবে
দিব·এবে ; রক্তস্রোতঃ শুষিবে ধরণী।
কুক্ষণে সাগর পার হইলি, দুর্মতি,
পশিলি রাক্ষসালয়ে চোরবেশ ধরি
হরিলি রাক্ষসরত্ন অমূল জগতে।

বাল্মীকি-রামায়ণে রাবণবধের ঠিক আগে রাম রাবণকে বলেছিলেন :

"রাক্ষসাধম, জনস্থানে আমার ভার্যাকে অসহায় দেখে হরণ করেছিলে, এতেই তুমি নিজেকে বীর মনে করো ? তুমি কুবেরের ভ্রাতা হয়ে অতি শ্লাঘনীয় কর্ম করেছ। দুর্মতি, চোরের ন্যায় সীতাকে হরণ করে তোমার লজ্জা হয়নি। আজ তীক্ষ্ণ শরাঘাতে তোমাকে আমি যমালয়ে পাঠাবো।"

কৃত্তিবাসে রাবণ লক্ষণকে শক্তিশেল নিক্ষেপের আগে এই বলে ভৎর্সনা করেছিলেন :

তোর বাণে বিভীষণ পেলে প্রতিকার।
মারি শেল তোরে দেখি কে রাখে এবার ॥
এখনি মরিবি ভণ্ড লক্ষণ তপস্বী।
মৃত্যুকালে মনে কর জানকী রূপসী ॥
মা বাপেরে মনে কর বন্ধু যতজন।
মৈলে সংগে আর নাহি হবে দরশন ॥

বাল্মীকি-রামায়ণে আমরা পাই ঃ

অচিন্তয়িত্বা তান্ বানান সমাশ্লিষ্য চ লক্ষ্মণম্।
অব্রবীচ্চ হনূমন্তং সুগ্রীবঞ্চ মহাকপিম্ ॥
লক্ষণং পরিবার্যৈব তিষ্ঠধ্বং বানরোত্তমাঃ
পবাক্রমস্য কালোহয়ং সম্প্রাপ্তো মে চিরেসিতঃ ॥
পাপাত্মায়ং দশগ্রীবো বধ্যতাং পাপনিশ্চয়ঃ।
কাঙ্খিতং চাতকস্যেব ঘর্মান্তে মেঘদর্শনম্ ॥
অস্মিন্ মুহূর্তে ন চিরাৎ সত্যং প্রতিশৃণোমি বঃ।
অরাবণমরামং বা জগদ্দ্রক্ষ্যথ বানরাঃ ॥

ষষ্ঠ সর্গে লক্ষণের গুপ্ত আক্রমণের প্রত্যুত্তর সপ্তম সর্গে রাবণের এই সরাসরি আক্রমণ। কিন্তু ষষ্ঠ সর্গে আক্রমণ ছিল প্রায় একতরফা, কারণ মেঘনাদ ছিলেন নিরস্ত্র; আর সপ্তম সর্গে যুদ্ধ সমানে সমানে। এমনকি রাবণও লক্ষণের বীরত্বকে অস্বীকার করতে পারছেন না—"বাঘানি বীরপণা তোর আমি, সৌমিত্রি কেশরি।" কিন্তু যুদ্ধের বর্ণনায় দুই সর্গের মধ্যে এক বিষয়ে সাদৃশ্য আছে। উভয় যুদ্ধ বর্ণনাই রীতিমতো সংক্ষিপ্ত। ষষ্ঠ সর্গে যুদ্ধই হয়নি, কাজেই যুদ্ধের বর্ণনা সেখানে হাতাহাতি ধ্বস্তাধ্বস্তির বিবরণ মাত্র! তীরে নির্জিত মেঘনাদ সেখানে অসির এক আঘাতেই ভূতলশায়ী। সপ্তম সর্গে অবশ্য সুদীর্ঘ যুদ্ধ বর্ণনার সুযোগ ছিল, কিন্তু কবি সে-সুযোগ গ্রহণ করেননি। ষষ্ঠ সর্গে লক্ষ্মণের একটিমাত্র খড়্গাঘাতের মতোই সপ্তম সর্গে রাবণ একবারেই মহাশক্তি নিক্ষেপ করেছেন এবং তাতেই "ভীমাঘাতে পড়িলা ভূতলে লক্ষ্মণ, নক্ষত্র যথা।" কৃত্তিবাসে দেখি রাবণ ও লক্ষ্মণের সংগে যুদ্ধের বর্ণনা অনেকটা দীর্ঘ, বিশেষ করে শক্তিশেল

নিক্ষেপের চিত্রটি। এই ক্ষেপণাস্ত্রকে উপলক্ষ করে রামের একটি শেল-স্তুতিও কৃত্তিবাসে সংযোজিত হয়েছে; এবং পরে রাম কর্তৃক লক্ষ্মণের বুক থেকে শেল-উৎপাটনের বর্ণনাও আছে। রামের শেলস্তুতি ও শেল-উৎপাটনের বর্ণনা বাগ্মীকি রামায়ণেও আছে। কিন্তু মধুসূদন এসব বর্ণনা সযত্নে পরিহার করেছেন। কবি লক্ষ্মণকে লঘু করেননি, কিন্তু রামকে একেবারেই তুচ্ছ করেছেন এবং সপ্তম সর্গের শেষে রামকে একেবারেই নিশ্চিহ্ন করেছেন। এর আগে রাবণের মুখ দিয়ে কবি বলিয়েছেন ঃ "না চাহি তোমারে আজি, হে বৈদেহীনাথ!" এটি কবির নিজের ইচ্ছা। শক্তিশেলের অধ্যায়ে তিনি রামের জন্য কোন ভূমিকাই স্বীকার করতে চান না! এখনে রাবণের বিজয়ীভূমিকা যাতে একেবারে অসপত্ন ও সম্পূর্ণ হতে পারে সেজন্য রামকে তিনি সম্পূর্ণ গোপন করে ফেলেছেন। বাগ্মীকির রামায়ণ থেকে উদ্ধৃত অংশে এর বিপরীত চিত্রই আমরা দেখতে পেয়েছি। সেখানে রাবণের বাণে বিচলিত না হয়ে রাম লক্ষ্মণকে আলিংগন করে সুগ্রীব ও হনুমানকে বলছেন, "তোমরা লক্ষ্মণকে বেষ্টন করে এইখানে থাকো, এখন আমার বহুদিনের আকাংক্ষিত পরাক্রম প্রকাশের সময় উপস্থিত। তোমরা শীঘ্রই দেখতে পাবে পৃথিবী অ-রাবণ বা অ-রাম হয়েছে। এই বলে রাম বৃষ্টিধারার ন্যায় শর নিক্ষেপ করতে লাগলেন এবং রাবণ নিপীড়িত হয়ে রণস্থল পরিত্যাগ করলেন।

দেখা যাচ্ছে, শক্তিশেলের পর পুত্রশোকে বলীয়ান রাবণকে ভ্রাতৃশোকে বলীয়ান রাম নিপীড়িত করেছেন। বাল্মীকি-রামায়ণ অনুসরণ করে কৃত্তিবাসও বলছেন ঃ

শ্রীরাম রাবণে যুদ্ধ বাজে আরবার।
ভাই শোকে যুদ্ধে রাম বিক্রমে অপার॥
বাছিয়া বাছিয়া রাম প্রহারেণ বাণ।
রাক্ষস কটক কাটি কৈলা খান খান॥
শ্রীরামের বাণে রাজা করে ধড়ফড়।
সহিতে না পারি রাজা উঠে দিল রড়॥

মধুসূদন এখানে একদেশদর্শী, তিনি শুধু রাবণের পুত্রশোকই দেখিয়েছেন, শক্তি শেলের পর রামের ভ্রাতৃশোকের উল্লেখ পর্যন্ত করেননি : "স্মরি পুত্রবরে শূর, হানিলা সরোষে মহাশক্তি।"

শক্তি-শেলের আঘাতে পতিত লক্ষণকে কবি পর্বতের সংগে তুলনা করে বলেছেন, "সপন্নগ গিরিসম পড়িলা সুমতি।" বাল্মীকি-রামায়ণের রামের মুখ থেকে কবি এই পংক্তিটি আহরণ করেছেন :

স দদর্শ ততো রামঃ শক্ত্যা ভিন্নং মহাহবে
লক্ষ্মণং রুধিরা দিগ্ধং সপন্নগমি—বাচ লম্।

কিন্তু কবি রামের নামটি উচ্চারণ করেননি। রামের কথাটি আত্মসাৎ করেছেন, কিন্তু বাল্মীকি-রামায়ণের এই অংশের অনেক কিছুই তিনি বর্জন করেছেন শুধু রাবণকে বড় করবার জন্য। রামের সেই বিখ্যাত বিলাপ যা রামায়ণ-পাঠক মাত্রেরই প্রিয় :

দেশে দেশে কলত্রা ণি দেশে দেশে চ বান্ধবা ঃ।
তং তু দেশং ন পশ্যামি যত্র ভ্রাতা সহোদর ঃ॥

কবি হৃদয়হীনের মতো অনায়াসেই বিস্মৃত হয়েছেন। রামায়ণ এড়াতে গিয়ে কিন্তু মধুসূদন এখানে একটি সূক্ষ্ম দ্বন্দ্বের মধ্যে নিজেকে ফেলেছেন। তিনি যদি রামায়ণ সম্পূর্ণ বিস্মৃত হতেন তা হলে কিন্তু এই দ্বন্দ্বে পড়তেন না। এই মুহূর্তে হোমারের ইলিয়াদ মহাকাব্যের স্মৃতি তাকে লংকা থেকে ইলিয়ামে নিয়ে গেছে এবং রক্তাপ্লুত মেঘনাদকে তিনি বীর হেক্তরের রক্তাপ্লুত দেহের সংগে অভিন্ন বলে ভেবেছেন :

গহন কাননে যথা বিধি মৃগবরে
কিরাত অব্যর্থ শরে, ধায় দ্রুতগতি
তার পানে ; রথত্যজি রক্ষোরাজ বলী
ধাইলা ধরিতে শবে। উঠিলা চৌদিকে
আর্তনাদ। হাহাকারে দেবনররথী
বেড়িলা সৌমিত্রি শূরে।

রামায়ণে বা কৃত্তিবাসে রাবণ দূর থেকে শক্তিশেল নিক্ষেপ করেছেন এবং তারপর

রামের আক্রমণে পর্যুদস্ত হয়ে রণক্ষেত্র ছেড়ে পালিয়ে গেছেন—

বিকীর্যমাণং শরজালবৃষ্টিভি
র্মহাত্মনা দীপ্তধনুষ্মতার্দিত ঃ।
ভয়াৎ প্রদুদ্রাব সমেত্য রাবণো
যথানিলেনাভিহতো বলাহক ॥

—রাবণ ধনুষ্মান মহান রামচন্দ্রের শরজাল বর্ষণে বিকীর্ণ ও নির্জিত হয়ে ভয়ে বায়ুতাড়িত মেঘের মতো পালিয়ে গেলেন। শক্তিশেলাহত লক্ষ্মণের ভূপতিত দেহের কাছে আসার কোনো সুযোগই সেখানে তাঁর ছিল না, তিনি নিজেই তখন প্রাণ নিয়ে পলায়ণ রত। তাছাড়া রথত্যাগ করে হঠাৎ লক্ষ্মণের 'শব' ধরবার জন্য তিনি ছুটে যাবেনই বা কেন? মরণোন্মুখ শত্রুকে শেষ আঘাত হানবার জন্য তিনি তীর বা অন্য অস্ত্র নিক্ষেপ করতে পারতেন। কিন্তু 'ধাইলা ধরিতে শবে' এর মধ্যে শেষ আঘাত হানার কোনো অবিলাষ ব্যক্ত হয়নি। কিরাতের চিত্রকল্পেও 'ধরতে যাওয়াই' বুঝাচ্ছে। কিন্তু লঙ্কার যুদ্ধ ক্ষেত্রে মৃত বা মৃতপ্রায় দেহ ধরবার অনুরূপ চেষ্টার উল্লেখ অন্য কোথাও আমরা পাই না। আসলে এটি এসেছে হোমরের ইলিয়াদ মহাকাব্যের দ্বাবিংশ (হক্তর বধ) সর্গ থেকে। মৃতদেহের সৎকার ইলিয়াদ মহাকাব্যের শেষ তিনটি সর্গ জুড়ে রয়েছে। তাঁর শবের যেন লাঞ্ছনা না করা হয় হেক্তরের এই শেষ অনুরোধ উপেক্ষা করে গ্রীক বীর আকিলেস হেক্তরের দেহ রথের চাকায় বেঁধে টেনে হিচড়ে নিয়ে গিয়েছিলেন ঃ

On this he dishonoured the body of Hector ; he pierced the sinews at the back of both his feet from heel to ankle and passed thongs of ox-hide through the slits he had made ; thus he made the body fast to his chariot, letting the head trail upon the ground. Then he had put the goodly armour on the chariot and had himself mounted, he lashed his horses on and they flew forward nothing loth. The dust rose from

Hector as he was being dragged along, his dark hair flew all abroad, and his head once so comely was laid low on earth, for Zeus had now delivered him into the hands of hies to do him outrage in his own land.

এরপর পুত্র হেক্‌তরের দেহের এই লাঞ্ছনা দেখে প্রায়াস ও হেকুবার উদ্‌ভ্রান্ত বিলাপের বর্ণনাও মর্মন্তুদ :

Thus was the head of Heator being dishonoured in the dust. His mother tore her hair and flung her veil from her with a loud cry as she rooked upon her son. His father made piteous moan, and throughout the city the people fell to weeping and wailing.

এরপর রয়েছে বিধবা আন্দ্রমাকের বিলাপ। মাইকেল মধুসূদন হেক্‌তর বধের শেষাংশ এখানে আমদানি করতে প্রলুব্ধ হয়ে রাবণকে রথ থেকে নামিয়ে লক্ষ্মণের শায়িত দেহের প্রতি তাঁকে ধাবিতও করিয়েছিলেন। কিন্তু রাবণের মতো তিনিও পিছিয়ে গেলেন, চারদিকের আর্তনাদ তাঁকে বিচলিত করলো; রামের অনুবর্তীরা লক্ষ্মণের দেহকে এননভাবে ঘিরে রাখলো যে তিনি আর সেই দেহ ছুঁতে পারলেন না। আকিলেসের অনুবর্তী গ্রীকদের ঐতিহ্য এবং রাম-অনুবতী ভারতীয়দের ঐতিহ্য এক নয়। এখানে পুরোপুরি গ্রীক দৃষ্টান্ত অনুসরণ করলে তা পাঠাকরা শিল্পসম্মত বলে মেনে নিতে পারতেন না। লক্ষ্মণ-দেহকে নিয়ে টেনে হিচড়ে রাবণ যদি রথের চাকায় বেঁধে ঘোড়া ছোটাতেন তবে তা হত বীভৎস। কবি নিজেও তা শেষ পর্যন্ত অনুমোদন করতে পারেননি এবং পারতেন না। পারেননি বলেই, রাবণও লক্ষ্মণের দেহ ধরতে গিয়েও এখানে ধরতে পারলেন না। আসলে রাবণের প্রতি মন বিরূপ হয়ে ওঠে' এমন কোনো প্রাসঙ্গই কবি অবতারণা করিতে চান না। এই নিবৃত্তির পক্ষে রামায়ণও মধুসূদনের কিছুটা সহায়ক হয়েছে। কারণ রামায়ণে আমরা দেখি রাম নিজেই তাঁর অনুগামীদের বলছেন লক্ষ্মণকে ঘিরে রেখে তাঁর দেহ রক্ষা করতে, ততক্ষণ তিনি রাবণের সঙ্গে যুদ্ধ করবেন :

লক্ষ্মণং পরিবার্যৈব তিষ্ঠন্তং বানরোত্তমাঃ।
পরাক্রমস্য কালোঽয়ং সম্প্রাপ্তো সে চিরেপ্সিত

অতএব মধুসূদনও গ্রীক দৃষ্টান্ত থেকে নিবৃত্ত হয়ে তাড়াতাড়ি বলেছেন, "হা হা কারে দেব নর রথী/বেড়িলা সৌমিত্রিশূরে।" এই সময় কিন্তু "হাহাকার" অথবা "উঠিলা চৌদিকে আর্তনাদ" কোনটিই রামায়ণে, বা কৃত্তিবাসে, নেই তা হলে মধুসূদন এই হাহাকার বা আর্তনাদ শুনলেন কী করে? মনে হয়, হেক্তরের মাতা পিতা ও জায়ার কণ্ঠে যে-আর্তনাদ উঠেছিল তাই মহাকবি মধুসূদন এখানে শুনতে পেয়েছেন। কিন্তু প্রায়াম হেকুবা ও আন্দ্রমাকের দীর্ঘ বুকফাটা বিলাপের অনুরূপ কোনো প্রসঙ্গ রচনা করতে তিনি উৎসাহী বা সাহসী হননি, কারণ তাতে পাঠকের মনে রাবণের প্রতি বিরূপতাই সৃষ্টি হবে। ঠিক এই কারণেই রামের বিলাপকেও তিনি প্রশ্রয় দেননি। মোট কথা, রাবণের গরিমা অক্ষুন্ন রাখায় প্রয়াসেই সপ্তম সর্গের দ্রুত সমাপ্তি ঘটানো হয়েছে, এবং বাল্মীকি ও কৃত্তিবাস থেকে মহাকবি মধুসূদন মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন। রুদ্রতেজে সমগ্র সর্গটি পূর্ণ। কাজেই যথেষ্ঠ অবসর থাকলেও বিলাপের অংশ-গুলিকে লালন করার চিন্তা কবি সযত্নে পরিহার করেছেন। "দেবনররথী বেড়িলা সৌমিত্রিশূরে" এটির জন্য মধুসূদন কিছুটা হোমরের কাছেও হয়তো ঋণী। ইলিয়াদের শেষ (চতুর্বিংশ) সর্গে আছে, আকিলেস কর্তৃক রথের চাকায় বেঁধে হেক্তরের মৃতদেহ টেনে নেবার দৃশ্য দেখে দেব আপল্লন দয়াপরবশ হন এবং তাঁর নিজের স্বর্ণ বেষ্টনী দিয়ে শবটি সর্বক্ষণ ঘিরে রাখেন ঃ

> **But Apollo would not suffer it to be disfigured, for he pitied the man, dead he now was; therefore he shielded him with his golden aegis continually, that he might take no hurt while Achilles was dragging him.**

হেক্তরের মৃতদেহ রক্ষা করার জন্য হোমারে দেবদেবীরা উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন। মধুসূদন হোমারের অনুসরণেই 'লক্ষ্মণের দেহ' রক্ষা নিয়ে শংকরশংকরী-কথোপকথন রচনা করেছেন ঃ

> **মারিল লক্ষণে, প্রভু, রক্ষঃ কুলপতি**
> **সংগ্রামে। ধূলায় পড়ি যায় গড়াগড়ি**

সুমিত্রানন্দন এবে। তুষিলা রাক্ষসে,
ভকত—বৎসলতুমি ; লাঘবিলা রণে
বাসবের বীরগর্ব ; কিন্তু ভিক্ষা করি,
বিরূপাক্ষ, রক্ষ, নাথ, লক্ষ্মণের দেহে।

"তুষিলা রাক্ষসে ভকত—বৎসল তুমি" এটির মধ্যে ভৎর্সনার চেয়ে অনুনয়ই বেশি। কিন্তু হোমরের আপল্লন দেবতাদের উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন যে তাঁরা তাদের ভক্তের মৃতদেহ কলুষিত হচ্ছে দেখেও কিছু করছেন না ঃ

You gods ought to be ashamed of yourselves; you are cruel and hard-hearted. Did not Hector burn you thigh-bones of heifers and of unblemished goats? And now dare you not rescue even his dead body for his wife to look upon, with his mother and child, his father Priam, and his people, who would forthwith commit him to the flames, and give him his due funeral rites?

"ধূলায় পড়ি যায় গড়াগড়ি সুমিত্রানন্দন এবে" এটিও লক্ষ্মণের মৃতকল্প দেহ সম্পর্কে সামান্য উদ্বেগ প্রকাশ মাত্র; হোমারে হেক্তরের মৃতকল্প দেহ সম্বন্ধে দেবতাদের উদ্বেগ এর চেয়ে বহুগুণ বেশি। তার কারণ আকিলেস হেক্তরের দেহের যে লাঞ্ছনা করেছিলেন রাবণ লক্ষ্মণের দেহকে সেইভাবে লাঞ্ছিত করেননি। রাবণ অনুরূপ লাঞ্ছনা করতে উদ্যত হয়েছিলেন, কিন্তু মধুসূদন তাঁকে লক্ষণের শবকল্প দেহটি শেষ পর্যন্ত ধরতে বা ছুঁতে দেননি।

শংকিতা শংকরী মহাদেবের কাছে লক্ষ্মণের দেহ রক্ষার প্রার্থনা জানালে শংকর দেবদূত বীরভদ্রকে রাবণের কাছে পাঠালেন; বীরভদ্রের অদৃশ্য আকাশ কণ্ঠ রাবণকে লক্ষণের 'শব' ছেড়ে লংকায় ফিরে যাবার নির্দেশ দিল। হোমারের ইলিয়াদেও দেখি হেক্তয়ের মৃতদেহটি যাতে তাঁর পিতা প্রায়াস নিষ্ক্রয় বা বিনিময়পণ দিয়ে আকিলেসের কাছ থেকে নিয়ে আসতে পারেন সেজন্য দেবাদিদের জিয়ূস দেবী থেটিসকে (Thetis) পাঠাচ্ছেন আকিলেসের কাছে তাঁর বার্তা দিয়ে এবং দেবী আইরিসকে (Iris) পাঠাচ্ছেন প্রায়াসের কাছে যাতে তিনি অবিলম্বে গ্রীক শিবিরে গিয়ে মুক্তি পণের বিনিময়ে আকিলেসের ও

কাছ থেকে পুত্র হেক্‌তরের মৃতদেহটি ভিক্ষা করে আনেন। দেবী থেটিস পুত্র আকিলেসের কাছে গিয়ে বলেছিলেন :

My son, how long will you keep on thus grieving and making moan? You are gnawing at your own heart, and think neither of food nor of woman's embraces; and yet these two were well, for you have no long time to live, and death and the storng hand of fate are already close beside you, now, therefore, heed what I say, for I come as a messenger from Zeus; he says that the goods are angry with you, and himself more angry than them all in that you keep Hector at the ships and will not give him up. Therefore let him go, and accept a ransom for his body. উত্তরে আকিলেস বল্লেন : So let it. If Olympian Zeus himself thus commands me, let him that brings the ransom bear body away. ইলিয়াদের শেষ সর্গের অনেকখানি জায়গা জুড়ে রয়েছে এই দেবদূতী ও নরের বার্তা বিনিময়। হোমার নিজেই মন্তব্য করেছেন : Thus did mother snd son talk together at the ships in long discussion with one another.

মধুসূদন কিন্তু দীর্ঘ বর্ণনার সমস্ত প্রলোভন সংবরণ করেছেন। দীর্ঘ কথোপকথন বা দীর্ঘ শোকবিলাপের সুযোগও তিনি গ্রহণ করেননি। তাঁর দেবদূতের বার্তা যেন তার বার্তা, সোজা এবং সক্ষিপ্ত :

মনোরথ—গতি,
রাবণের কর্ণমূলে কহিলা গম্ভীরে
বীরভদ্র; "যাও ফিরি স্বর্ণ লংকাধামে
রক্ষোরাজ। হত রিপু, কি কাজ সমরে?" .....

শেষ অংশটুকু অবশ্য 'অশ্বত্থামা হত ইতি গজ'র মতোই ছলনাময় অর্ধসত্য এবং সম্ভবত মহাভারতের বিখ্যাত উক্তিটির অনুকরণেই রচিত। যেটি আমাদের বিস্ময়ের উদ্রেক করে তা হচ্ছে মধুসূদনের আশ্চর্য মিতভাষিতা এবং কাহিনীর অতিবিস্তারে নিতান্ত অনীহা। এখানে তিনি হোমরের অনুকরণে অনায়াসেই

নিকষাবেশিনী দেবদূতী বা স্বপ্ন-দূতীকে পুত্র রাবণের কাছে পাঠাতে পারতেন, যেমন পঞ্চম সর্গে সুমিত্রার বেশে 'স্বপ্নদেবী' কে কবি পাঠিয়েছিলেন লক্ষণের কাছে নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে মেঘনাদবধের সংকেত জানাতে। সপ্তম সর্গে এখানে কবি 'স্বপ্নসম দেবদূত'-এর উল্লেখ করেছেন, কিন্তু স্বপ্ন-দেবীকে রাবণমাতা বেশিনী দেবদূতী করে পাঠাননি। ফলে নিমেষের মধ্যে বীরভদ্র অদৃশ্য হয়েছেন এবং রাবণও লক্ষণকে ফেলে রেখেই রথে চড়ে লংকায় ফিরে গেছেন। রাবণের যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবেশের ও প্রস্থানের মধ্যেকার সময়-দৈর্ঘ্য খুবই সংক্ষিপ্ত; রাবণ যেন এলেন শক্তি শেল নিক্ষেপ করলেন এবং চলে গেলেন, একেবারে **vini, vidi, vici,**। এই সর্গে রাবণ সম্পূর্ণ অপ্রতিহত, অপ্রতিদ্বন্দ্বী এবং অব্যর্থ।

রাবণ এখানে চূড়ান্ত বিজয়ী। সমগ্র মেঘনাদবধকাব্যে একমাত্র রাবণই এমন চূড়ান্ত বিজয়ের অধিকারী; এ হিসেবে তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী নায়ক। চূড়ান্ত বিজয় সপ্তম সর্গ ছাড়া আর কোথাও নেই এবং প্রকৃত বিজয়সংগীত এখানে ছাড়া এই মহাকাব্যের অন্য কোথাও এমনভাবে ধ্বনিত হয়নি। এখানে দেবশক্তির পরাভবও চূড়ান্ত। এমনই চূড়ান্ত যে পরাভবের গ্লানি ও লজ্জা নিয়ে দেবরাজ ইন্দ্রের স্বর্গে মুখ লুকানো ছাড়া গত্যন্তর থাকেনি ঃ

হেথা পরাভূত যুদ্ধে, মহা অভিমানে
সুরদলে সুরপতি গেলা সুরপুরে।

রাবণ এখানে প্রকৃত এপিক নায়ক, যিনি তাঁর দেশ, জাতি ও ঐতিহ্যের সংগে একাত্ম, অভিন্ন। তাই এই শ্রেষ্ঠ বিজয়ের মুহূর্তে মহানায়ক রাবণের মুখটিকে কবি আলাদা ক্লোজ-আপে দেখাননি। রাবণ রথে আরোহণ করা মাত্র এই বিজয় সমগ্র রক্ষঃ-অনীকিনীর বিজয়ে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। লংকায় রাবণ প্রবেশ করেছেন কিনা তা আর আমাদের জানবার দরকার নেই, বিজয়ী রাক্ষস-বাহিনী লংকাপুরে প্রবেশ করছে কবি বারে বারে বলতে চেয়েছেন। এমন কি বন্দীরা রাবণকে বন্দনা করছেন এমন কথা বলা হয়নি, বলা হয়েছে বন্দীরা রাক্ষসসেনাকেই বন্দনা করেছে।

এই সর্গে কবি মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর ২য় (মহিষাসুর সৈন্যবধ), ৩য় (মহিষাসুর বধ),

৭ম (চণ্ডমুণ্ড বধ) অধ্যায়ের উল্লেখ আগেই করেছেন ; ৪র্থ (দেবীস্তুতি) ও ৮ম (রক্ত বীজবধ) সর্গের উল্লেখ করে কবি এই সর্গের উপসংহার টানছেন। মার্কণ্ডেয় পুরাণে রক্তবীজনিধনের উপসংহারে এরূপ বর্ণনা আছে :

মুখে সমুদগতা যেহস্যা রক্তপাতাম্ব হাসুরা।
স্তাংশ্চখাদাথ চামুণ্ডা পপৌ তস্ত চ লোণিতম্ ।।
দেবী শূলেন বজ্রেণ বাণৈরসিভির্বষ্টিভিঃ।
জঘান রক্তবীজং তং চামুণ্ডাপীতশোণিতম্ ।।
স পপাত মহীপৃষ্ঠে শস্ত্রংঘসমাহতঃ।
নীরক্তশ্চ মহীপাল রক্তবীজো মহাসুরঃ ।।

—তারপর এর (এই কালী বা চামুণ্ডার) মুখগহ্বরে পতিত রক্তবিন্দু থেকে যেসব মহাসুর উদ্‌গত হল চামুণ্ডা তাদের ভক্ষণ করলেন এবং রক্তবীজের রক্তও পান করলেন। চামুণ্ডা কর্তৃক রক্তবীজের রক্ত পান করা হয়ে গেলে চণ্ডিকাদেবী রক্তবীজকে শূল, বজ্র, বান, অসি ও খড়্গ প্রভৃতির আঘাতে বধ করলেন। হে মহীপাল! সেই মহাসুর রক্তবীজ শস্ত্রসমূহ দ্বারা ভীষণভাবে আহত ও রক্ত শূন্য হয়ে মাটিতে পতিত হন।

চামুণ্ডার জয়োল্লাসের সংগে রাক্ষসবাহিনীর বিজয়োল্লাস এখানে তুলিত হয়েছে। রাক্ষসবাহিনীর রিজয় কিন্তু এখানে দেবসৈন্য ও দেবরাজ ইন্দ্রের চূড়ান্ত পরাজয় ও গ্লানি। অথচ রক্তবীজবধের পর মার্কণ্ডেয় পুরাণে স্পষ্টই বলা হয়েছে, দেবগণ অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলেন :

ততস্তে হর্ষমতুলমবাপুস্ত্রিদশা নৃপ।

আগেও আমরা দেখেছি, এখানেও দেখছি, এই চিত্রকল্পের মধ্যে কবি রাবণ-সৈন্যকেই দৈবী শুভশক্তির পর্যায়ে উন্নীত করে ফেলেছেন :

পশিলা পুরে রক্ষঃ অনীকিনী
রণবিজয়িনী ভীমা, চামুণ্ডা যেমতি
রক্তবীজে নাশি দেবী, তাণ্ডবি উল্লাসে,

অট্টহাসি রক্তাধরে, ফিরিলা নিনাদি,
রক্তস্রোতে আর্দ্রদেহ।

চণ্ডীর চতুর্থ ও একাদশ অধ্যায়ে আছে যথাক্রমে দেবীস্তুতি ও নারায়ণীস্তুতি। মহিষাসুরবধের পর ইন্দ্রাদি দেবগণ দেবীর স্তুতি করেন এবং তম্ভবধের পর আবার দেবতারা দেবী নারায়ণীর স্তুতি করেন। নারায়ণীস্তুতির উপসংহারে দেবী বলেছিলেন :

ইত্থং যদা যদা বাধা দানবোত্থা ভবিষ্যতি।
তদা তদাবতীর্যাহং করিষ্যাম্যরি সংক্ষয়ম্ ।। (১১।৫৫)

—'এইভাবে যখনি দানবগণের উদ্ভবের ফলে বিঘ্ন বা উৎপীড়ন ঘটবে তখনি আমি আভির্ভূত হয়ে শত্রুবিনাশ কোরবো।'

এই দানবগণই রাক্ষসবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে রাবণের পক্ষে যুদ্ধ করেছে। অথচ মাইকেল মধুসূদন তাঁর মহাকাব্যে এই দানবগণেরই স্তুতি করেছেন। শুধু তাই নয়, এই দানব বা রাক্ষসবাহিনীর সংগে তুলনা করেছেন দানবদলনী দুর্গার। আপাতদৃষ্টিতে এই তুলনা অসংগত হলেও কবি এমন বিষম চিত্রকল্প রচনা করে দেবদানবের জন্য পুরাননির্দিষ্ট পুরোনো মূল্যবোধই বদলে দিতে প্রয়াসী হয়েছেন। একই সর্গে একাধিকবার এই বিষম চিত্রকল্পের প্রয়োগকে তাই কবিপ্রমাদ বা আর্ষপ্রয়োগ বলে দেখলে ভুল করা হবে। বিশেষ করে সপ্তম সর্গের শেষে যেখানে রাবণ ও রাক্ষসবাহিনীর বিজয় মহিমান্বিত, সেখানে তাদের বিজয়কে দেবীচণ্ডীর বিজয়ের সংগে তুলনা নিশ্চয়ই অর্থবহ :

দেবদলমিলি
স্তুতিলা সতীরে যথা, আনন্দে বন্দিলা
বন্দীবৃন্দ রক্ষঃ সেনা বিজয় সংগীতে ।।

এটি মাইকেল কর্তৃক উনিশ শতকী ভারতীয় রেনেসাঁসেরই বিজয়সংগীত ও বন্দনা। মধুসূদন এই সর্গের নাম দিয়েছেন 'শক্তি নির্ভেদ'। রাবণ শক্তিশেল ছুঁড়ে লক্ষ্মণকে ভূপতিত করেছেন। মধুসূদনও তাঁর কবি প্রতিভার শক্তি দিয়ে নির্ভুলভাবে লক্ষ্যভেদ করেছেন এবং পৌরাণিক দৈবাশ্রিত মূল্যবোধকে ভূমিসাৎ করতে সমর্থ হয়েছেন।